(খ) "আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।" —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(গ) " মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ইয়ে, এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচিতে চাইবেই।"—কোন পটভূমিকায় কে এই কথাগুলি বলেছেন? কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) "এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।" কোন্ প্রসঙ্গে কে কাকে এ কথা বলেছেন?

৩। শব্দার্থ লিখুন ঃ

লোভানি, খেলাপ, শরম, ইজ্জৎ, অনাহক, গাঁতা, ' ব্যাদরা ছেলে' আহাম্মক।

৪৭.১৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী—১

১। উদ্দেশ্য পর্যায়ে ৮ টি উদ্দেশ্যের পরিচয় দেওয়া আছে। এ থেকে যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। (ক) আগুন (১৯৪৩), খ) ১৯৪৪, গ) ২য় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত ছাড়ো ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, জনযুদ্ধ নীতি।

(খ) মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো।

৩। 'অরণি,দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের, শ্রীরঙ্গাম।

৪। (ক) ৬.৪ -এ মূলপাঠ ১-এর ক) অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

(খ) অঞ্জনগড়, কেরানী, ল্যবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী—এর যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। এই পর্বের নাটকের বিষয়বস্তু সমাজের কৃষক, শ্রমিক অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তের শোষণ-বঞ্চনা। লক্ষছিল এই মানুষগুলির মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠনের মাধ্যমে নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা।

অনুশীলনী—২

১। (ক) ব্ল্যাক মার্কেট, মজুতদার, চতুর্গুণই।

(খ) খরখানাই, তর, পথই, একাকার।

(গ) বাপের নাম, বয়ান, হিন্দু, মুসলিম, দোস্তালি।

২। (ক) ৪২-এর আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রধান সমাদ্দারের দুই পুত্র শ্রীপতি, ভূপতি শহীদ হয়েছে। এই শূণ্যতা বোধ থেকে প্রধান কুঞ্জকে চিত্ত বিহ্বলতা জনিত কারণে এই উক্তি করেছেন।

(খ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পুলিশী অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত বাংলার গ্রামবাসীরা যখন ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে বাদাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে তখন এ দৃশ্য দেখে পঞ্চাননী ক্ষোভে দুঃখে কুঞ্জকে একথা বলেছেন।

(গ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে 'দয়াল' এই কথাগুলি বলেছেন। যুদ্ধ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মন্বন্তরে-এ যে মানুষগুলি গাঁ ছাড়া হয়েছিল, দুর্যোগের অবসানে তার একে একে গ্রামে ফিরেছে। নতুন করে ঘর বেঁধে, জীবনযাত্রা শুরু করার কালে একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। দিগম্বরের কথায় সামান্য হতাশার সুর বাজতেই বললেন, মানুষতো বাঁচতেই চায়। এটাইতো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মন্বন্তরে সর্বহারা নিরঞ্জন দেখ না নতুন করে ঘর বেঁধে সকলকে নিয়ে সভা করে , আগামী দিনের সংকট উত্তরণের কথা বলছে। এটা স্বাভাবিক। নিরঞ্জন বলে দুঃখ-কষ্টের কথা তো স্বাভাবিক, সে তো মানুষের চিরসাথী, দু-দণ্ড বসে আলাপ আলোচনা করলে খানিকটা উপশম হতে পারে। সকলে এত সম্মতি দেয়। উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে দিয়ে এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তই তাৎপর্য হিসাবে প্রতিপন্ন।

(ঘ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে গ্রামের মানুষজন এক একে ফিরে এসে নিজেদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে নিরঞ্জন বরকত একথা বলেছেন।

ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি সারাই করে নিজেবাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। কখনও দুর্যোগ যেমন আসে, তার অবসানও হয়—মানুষের জীবনযাত্রা কখনই নিস্তরঙ্গ নয়, তার উত্থান-পতন আছে। ধৈর্য্য ধরে তাকে মোকাবিলা করতে হয়। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মিলবে। প্রধান বরকত তার অভিজ্ঞতা থেকে নিরঞ্জনকে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

৩। লোক দেখান, কথা না রাখা / প্রতিশ্রুতি ভঙ্গাকরা, লজ্জা, সম্মান, অন্যায়/ অসঙ্গাত, যৌথ খামার, দুষ্টু/বেয়ারা ছেলে, বোকা।

৪৭.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য — নবান্ন (প্রথম সংস্করণ)।
২। দর্শন চৌধুরি — গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।
৩। দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার মণ্ডল ঃ প্রসঙ্গ নবান্ন (লিপিকা)
৪। মন্দিরা রায় — বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত।
৫। সুধী প্রধান — নবান্ন ঃ প্রযোজনা ও প্রভাব।

একক ৪৮ ❐ নবান্ন নাটকের আলোচনা

৪৮.১ উদ্দেশ্য
৪৮.২ প্রস্তাবনা
৪৮.৩ নবান্ন—রচনা, দেশকাল ও নামকরণ
৪৮.৪ নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
৪৮.৫ সারাংশ
৪৮.৬ অনুশীলনী ১
৪৮.৭ নবান্ন নাটকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা
৪৮.৮ নবান্ন নাটকের গঠন
৪৮.৯ সারাংশ
৪৮.১০ অনুশীলনী ২
৪৮.১১ নবান্ন নাটকের চরিত্র আলোচনা
৪৮.১২ নবান্ন নাটকের সংলাপ ও গান
৪৮.১৩ সারাংশ
৪৮.১৪ অনুশীলনী ৩
৪৮.১৫ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান
৪৮.১৬ 'নবান্নে'র শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য
৪৮.১৭ সারাংশ
৪৮.১৮ অনুশীলনী ৪
৪৮.১৯ উত্তর-সংকেত
৪৮.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৪৮.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককটিতে আপনি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি সম্পূর্ণই পড়েছেন। নাটক পাঠ সূত্রে আপনি একদিকে যেমন লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্টিকর্মের সাধারণ পরিচয় পেয়েছেন, সেইসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলন ও প্রসঙ্গত নবান্ন নাটকের ভূমিকাটিও দেখেছেন।

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনি নাটকটির সাহিত্যিক মূল্য ও সেইসঙ্গে সংলাপ ও মঞ্চ পরিচালনার সম্পর্কে জানবেন।

- জানবেন কোন দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির রচনা ও অভিনয়।
- নাটকের 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন।
- নাটকের নয়া ভাবনা ও চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্ব লক্ষ করুন।
- নাটকটিতে কয়েকটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলির প্রয়োগ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৪৮.২ প্রস্তাবনা

ভাববাদী শিল্পী দার্শনিকরা মনে করেন, দৈবানুগ্রহে তাদের অনুভবে, মননে, নতুনতর ভাবোদয় হলে, সেটি ব্যক্ত না করা পর্যন্ত, তাঁদের নিস্তার নেই। কিন্তু যাঁরা বস্তুবাদী চিন্তা ও ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা বস্তুবিশ্বের সার্বিক কল্যাণ ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 'নবান্ন' নাটক রচনার পেছনে তাই সক্রিয় দেখা যায় সেই সময়ের সমাজমনস্ক ইতিহাস রাজনীতি সচেতন কিছু মানুষ তাঁদের উন্নত চেতনা নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলন গানে,গল্পে, নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশে উদ্যত হলেন। গণনাট্য আন্দোলন তাঁরই ফলশ্রুতি।

তাই এঁদের নাট্য প্রযোজনায় বাংলা নাট্যধারায় নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা গেল। নাটকে কৃষক শ্রমিকের মধ্যবিত্ত মানুষের কথা এলো। ব্যক্তি চরিত্র থেকে সমষ্টি চরিত্রের প্রাধান্য দেখা গেল। বস্তুতান্ত্রিক জীবনভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, আবেগের চেয়ে বুদ্ধি-যুক্তির প্রাধান্য, শ্রেণী চেতনাসূত্রে সমাজে শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র নাটকে দেখা দিল। ধনী জমিদার এবং শাসনযন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আর মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ পেল অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষগুলিরজন্য। মঞ্চ ও প্রয়োগ কলায় সমন্বয়, সৃষ্টি করে নানা বৈচিত্র্য আনা হল। এই প্রেক্ষপটে নবান্ন নাটক রচনাও তার ব্যাপক মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন, গণনাট্য সংঘের পতাকা তলে। 'নবান্ন' তাই গণনাট্যের নাটক, গণআন্দোলনের নাটক। আর এখানেই তার সিদ্ধি, তার সাফল্য আর ব্যর্থতা। নবান্ন' পাঠ ও আলোচনায় এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে।

৪৮.৩ রচনা, দেশকাল ও নামকরণ

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪- এ (দ্বিতীয় ১৯৪৫ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫)। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গমে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কোনো শিল্পসৃষ্টি দেশকালের সীমার উর্ধ্বে নয়। কালোত্তীর্ণ হতে পারে যে রচনা, তাই চিরন্তনের মর্যাদা পায়।

'নবান্ন' যে দেশকালের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে সেটি ছিল বড় দুর্যোগের, এক ক্রান্তিকালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ১৯৩৯ -এ। ভারতের বিদেশী শাসক রাজশক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। একদিকে হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনীর ইটালী, ফ্রাঙ্কের স্পেন, তোজোর জাপান ও গ্রীসের ফ্যাসিস্ট শক্তি, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, তার দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। ওদিকে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী সংগঠিত হতে প্রয়াসী হয়েছে রমাঁ রলাঁ, গোর্কি, রাসেল, শ প্রভৃতি প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা যুক্ত মঞ্চ তৈরি করে, পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কোলকাতাতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজিম এণ্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় কমিটি। এই রাজনৈতিক বাতাবরণে ১৯৪৪ -এ বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের প্রকাশ নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। নাটকটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গামে, ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৪৪ নাট্য পরিচালক ঃ বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভুনাথ মিত্র। শ্রীরঙ্গামে সাতবার অভিনয়ের পর ,শিয়ালদা রেলওয়ে ম্যানসন, শ্রী ও কালিকা থিয়েটার, প্রত্যেকটিতে সাতদিন করে নবান্নের অভিনয় হয়। এই নাটকের মধ্যেদিয়ে অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষের জীবন, লড়াই, সংগঠন ও সংগ্রামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ ও চিন্তাশীল দর্শক সমাজ মতুন করে বাঁচবার একটি পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছে।

নাট্যকার স্বয়ং নাটকের পটভূমিকায় পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। সে পরিচয় প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী-পুত্রের আত্মবিসর্জনের ঘটনায় প্রতিফলিত। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি যে সামাজিক- প্রাকৃতিক ঘটনা এ নাটকে ফুটে উঠেছে তা হল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশে ঘটে যাওয়া সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যয়ের ইতিহাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণিত হল—বাংলা সন১৩৫০-এর মন্বন্তর। আর এই মন্বন্তর গ্রাম গঞ্জের চাষী-ক্ষেতমজুরকে ক্ষুধার অন্নের সন্ধানে নিয়ে এসেছে শহরের ফুটপাতে, লঙ্গারখানায়। ক্ষুধার জ্বালাতেই প্রধান দোরে দোরে ঘোরে দু-মুঠো ভাতের জন্য, কুঞ্জ ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে করতে গিয়ে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে। ওদিকে মন্বন্তরের সুযোগ নিয়ে কালীধন অতিরিক্ত মুনাফার জন্য চাল গুদামজাত করে কালোবাজারী করে। সেবাশ্রমের আড়ালে নারী দেহের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। হারু দত্ত নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে শোযন করতে দ্বিধা করেনা। অবশ্যম্ভাবীরুপে দেখা গেল, মনুষ্যত্বের অ পমৃত্যু। দেশকালের এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলা যখন শ্মশানভূমিতে পরিণত, সেই সর্বস্ব হারানো গ্রামের বাস্তব চিত্র এই 'নবান্ন'।

'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য :

সমাপ্তি দৃশ্যের অভ্যন্তরে নিহিত আছে 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য। নবান্ন শব্দটির অর্থ হল নতুন অন্ন। নবান্ন শব্দটি ভাঙলে তাই দাঁড়ায়। নব অন্ন—নবান্ন। নতুন অন্ন এখানে বিশেষ তাৎপর্যে মন্ডিত। নবান্ন হল নতুন চালের পায়সান্ন। গ্রাম বাংলার কৃষকের নতুন ধান কেটে ঘরে তুলে সেই নতুন ধানের নতুন চালে পায়সান্ন তৈরি করতো। শুধু পায়সান্নই নয় পিঠেপুলিও হত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে তা আনন্দের সঙ্গে খেত। সমস্ত গ্রাম বাংলায় এটি ছিল একটি বিশেষ উৎসব। এই নির্দিষ্ট দিনটিতে খেলাধূলো, এবং প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। মানুষ সমবেত হয়ে সেই অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা দেখতো এবং উপভোগ করতো। অবিভক্ত গ্রাম বাংলার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে এই নবান্ন উৎসবে

আড়ম্বর ছিল সর্বাধিক। গ্রামের বৌ-ঝিদের এই উৎসবে ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। এই উৎসবের সঙ্গো লোকসংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক ছিল। অধুনা, সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বহু ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম্য সংস্কৃতির মতো নবান্ন উৎসবও আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবে এখনো দুই বাংলার গ্রামের প্রান্ত প্রদেশে এই দিনটিতে প্রবেশ করলে নবান্ন উৎসবে গান বাজনার ভগ্নবিশিষ্টের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখনো মাঝবেলায় কোনো কোনো গ্রাম্যবধূ নতুন বস্ত্র পরিধান করে পবিত্র দেহ মন নিয়ে নবান্ন রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। এখনো কোনো বাড়ির আনাচে কানাচে নাক রাখলে রুপশাল অথবা কামিনীর নবান্নের সুবাস এসে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। কোথাও কোথাও গৃহ বধূর আলতা পরা পায়ের আঘাত পড়ে ঢেঁকির পাড়ে, চাল সেই আঘাতে গুঁড়ো হয়ে পিঠে পুলির উপকরণে পরিণত হতে দেখাযায়। অবশ্য এটি অতি বিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে এটি অতিবিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে ঢেঁকি উঠে গেছে, এসেছে যন্ত্র। সভ্যতা সমাজকে এগিয়ে এনেছে ঠিক , কিন্তু প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব গুলো আজ তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলান্ত তিমিরে। আজ গ্রাম্য সংস্কৃতি হয়ে গেছে প্রায় বিলীন।

'নবান্ন' নাটক আমাদের মনে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনে নবান্ন উৎসবের ছবি । বন্যা, মহাযুদ্ধ-মহামারী আমিনপুরের গ্রাম্যজীবনের সুস্নিগ্ধ দিন যাপন পদ্ধতির বুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। মানুষ হয়েপড়েছিল জন্তুপ্রায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মান-সভ্রমহীন ভিখিরীতে রুপান্তরিত হয়ে মানুষ ভুলতে বসেছিল আপন অস্তিত্ব। এই রকম এক ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ পূর্ণ দিনে যেখানে অস্তিত্বের প্রশ্নটা ছিল সবচাইতে বড় প্রশ্ন, সেখানে নবান্নের উৎসবের কথা ভাবাই যায়না। কিন্তু এত ঝড় ঝাপটায় সেই মানুষ মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার স্মৃতিকে। তাই যখন আবার ঘরছাড়া মানুষগুলো ফিরে এসেছে গ্রামে, নতুন ধান তুলেছে ঘরে , তখন নবান্ন উৎসবের কথা জেগে উঠেছে । নবান্ন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তারা। তাই বিগত দিনগুলোর বিভীষিকা মন থেকে মুছে ফেলে আয়োজন করেছে নবান্ন উৎসবের। এই নবান্ন উৎসব শুধুমাত্র উৎসব নয় ,এর ভেতর একটা মিলনের ইঙ্গিত আছে। পূর্বেই আমরা বলেছি, এই উৎসব প্রত্যেক বাড়িতে হত, তবুও প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গো মিলেমিশে আনন্দে অংশগ্রহন করতো। তারপর সমবেত হত কোনো প্রান্তরে, গ্রাম্য সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগদিয়ে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করত সেই আনন্দ। 'নবান্ন' নাটকের শেষে আমরা দেখি সেই রকম এক পরিবেশ। নবান্নের উৎসবে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমবেত হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। যে হিন্দু মুসলমান অতীতে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে একে অপরকে সন্দেহ করেছে, সেই হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে নবান্ন উৎসবের চাঁদোয়ার নিচে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন,একটা বিরাট ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে যাঁরা পারস্পরিক হনন লিস্পায় মেতে ওঠে তাঁরাই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দিশার প্রীতি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু কালোরাত্রির মতো সেই ভ্রান্তিটা একদিন কেটে গিয়ে আবার রচিত হয় মিলনের ক্ষেত্র। নবান্ন উৎসব প্রাঙ্গনে তাই দেখা গেল হিন্দু মুসলমান সকলে এসে জড় হয়েছে। শুধু জড় নয়, এই উৎসব ক্ষেত্র থেকে সকলে শপথ গ্রহন করছে আকালের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধের । সুতরাং 'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য এদিক থেকে যথেষ্ট। নবান্ন উৎসব 'নবান্ন' নাটকে শুধু উৎসব থাকেনি,

হিন্দু মুসলমানের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গণনাটকের যেটি উৎসব প্রধান উদ্দেশ্য—চেতনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এক আদর্শের পতাকাতলে এনে ফেলা,— নাট্যকার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটকের শেষ দৃশ্যে নবান্নের উৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যকার তার চরিত্রগুলোকে বহু ঝড় ঝাপটা বহু বিসর্পিল পথ ঘুরিয়ে পুনরায় অতি পরিচিত নবান্ন উৎসবের অনাবিল আনন্দের মধ্যে এনে জীবনের একটি ইতিবাচক ইঙ্গিতের দ্যোতনা করেছেন।

৪৮.৪ নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

'নবান্ন' চার অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা পাঁচ। দ্বিতীয়ে পাঁচ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙেক দুই ও তিনটি দৃশ্য আছে । অর্থাৎ মোট পনেরোটি দৃশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার গ্রাম ও শহর জীবনের শঙ্কা ও সঙ্কটের চিত্র তুলে ধরে সমস্যার একটি ইতিহাচক সমাধানসূত্র তুলে ধরেছেন।

রাতের অন্ধ্রকারে মালভূমির মত উঁচু জায়গায় কতকগুলি ছায়ামূর্তির আনাগোনা দিয়ে নাট্যদৃশ্যের সূচনা। পটভূমিতে আগুনের আভা, বাইরে বাঁশের গাঁট ফাটার মধ্য দিয়ে মেসিনগানের আওয়াজ বোঝানো হয়েছে। পরিবেশের মধ্যে বেশ একটি সন্ত্রস্ত ভাব। আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে গাঁয়ের মধ্যে একটি সদা সন্ত্রস্তভাব বিরাজ করছে। বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার আগষ্ট আন্দোলনের কর্মী তাঁর দুই ছেলেকে হারিয়ে বিলাপ করছে। তার স্ত্রী পঞ্চাননীও মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে দেখে এবং স্বদেশের টানে নিজে আন্দোলনে যোগ দিয়ে, পিছিয়ে পড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। পথেই পুলিশের গুলিতে সে মৃত্যু বরণ করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কুঞ্জ,প্রধান, নিরঞ্জনের সঙ্গে রাধিকা,বিনোদিনীর পারস্পারিক সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংকটের দিনে অভাবী সংসারের সরল মানুষগুলির পারস্পরিক কলহ উত্তাপের ছবি ফুটে উঠেছে। সংসারের ভার বহনে যখন পুরুষরা অসহায় ও হীনমন্যতায় ভুগছে তখন নারীদের অসহায়তা ও সেইসঙ্গে অসহিষ্ণুতা বোধ আরও বেশি হবে ,এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । এর পরিচয় পাওয়া যায় কুঞ্জ রাধিকা ও নিরঞ্জন-বিনোদিনীর কথোপকথনে।

তৃতীয় দৃশ্যে সংকটের আরও ঘনীভূত রুপ দেখা যায় প্রধানের জমি বিক্রি করবার উদ্যোগের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত মানুষের এই দুর্দশার সুযোগ নেয়, হারাধনের মত পোদ্দাররা। অপর কৃষক দয়াল এ-ভাবেই সব হারিয়েছে, এমন কি বীজধান পর্যন্ত। অবশেষে তাকে প্রতিবেশী সমাদ্দার বাড়ি চালের সন্ধানে যেতে হয়েছে। স্ত্রী রাঙার মা "ধুঁকছে কাল বিকেল থেকে"। এই দৃশ্যেরই শেষে আকস্মিকভাবে ঝড় ওঠে, সাইক্লোনে প্রধানের দোচালা বিনোদিনীর মাথার ওপর ভেঙে পড়ে—সে অচৈতন্য হয়ে যায়। ওদিকে বন্যায় সব ভেসে যায়। দয়াল বাড়ি গিয়ে দেখে রাঙা, রাঙার মা বন্যায় ভেসে গেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে এরই পরিণতিতে ভয়াবহ অভাব ও অন্নসংকট। "নিত্যি ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল"— এর বিরুদ্ধে কুঞ্জের ছেলে মাখন বিদ্রোহ করে।*

পঞ্চম দৃশ্যে ওদিকে হারু দত্তের লোভ প্রধানের জমির জন্য। প্রধান সব বোঝে। তার সঙ্গে জমি বিক্রি নিয়ে কথা হয়। প্রধান রাজি না হওয়ায় সে নতুন ভাবে চাপ দেয়। কুঞ্জ উপলব্ধি করে "টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দাও।" হারুর লোকজন কুঞ্জ ও প্রধানকে মারে। মাখন এ দৃশ্য দেখে মাথা ঘুড়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু সমস্ত পরিবারকে বিচলিত করে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু শহরে। কোলকাতার চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে নিরঞ্জন রাখহরি নাম নিয়ে মজুরের কাজ করে। হারু দত্ত গ্রাম থেকে চাল ও মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে কালীধনকে সরবরাহ করে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মজুরদারী ও কালোবাজারী যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় যে জেঁকে বসেছে তার ছায়া এই দুটি চরিত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। এরা বিবেকহীন ও হৃদয়হীন ও অমানবিক বাণিজ্যিকতার জাল সমাজের সর্বত্র বিস্তৃত করে রাখে—সে পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যায়ভাবে চড়া দামে চাল বিক্রির প্রতিবাদ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে বশংবদ কর্মচারী ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলে "কত জন ম্যাজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখবার পারে তা নি জানো।" এদেরই চক্রান্তে ও রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষণায় 'মনুষ্যসৃষ্টি দুর্ভিক্ষ' লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

অপর দৃশ্যে দেখা যায় সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরের পার্কে আশ্রয় নিয়েছে দুমুঠো খাবার আশায়। এরই মধ্যে বিচিত্র ধরনের সুযোগ সন্ধানীরা নানা রুপে ও বেশে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রহীন এই নিরন্ন কঙ্কালসার মানুষগুলোকে নিয়ে নির্লজ্জভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। এদের কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা টাউট। প্রথমোক্তরা প্রধানের ভাষায় 'কঙ্কালের ছবির ব্যবসাদার,' তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা রাজপথের খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমোক্ত জন বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারছে না, আর অপরজন ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুরে-মানুষে লড়াই করছে। এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। ওদিকে বড়লোকের বাড়ি পানভোজনের সমারোহ, কিন্তু সামান্য উদ্বৃত্তটুকুও দুর্গত মানুষের কল্যাণে দিতে এদের হাত ,সরেনা। ওদিকে দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হারু একদিকে বিপন্ন মানুষের জমি বাড়ি সস্তায় কিনে নেয়, অপরদিকে গ্রামের দুঃস্থ মা-বাপকে ভুল বুঝিয়ে মেয়ে কেনে, শহরে চালান দেয়। কালীধনের সেবাশ্রম সেবা-নামের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ কালীধনের দোকানে দারোগা পুলিশের আবির্ভাব—চালক্রেতা ভদ্রলোক তাদের নিয়ে এসেছেন। নিরঞ্জন ইতোমধ্যে সেবাশ্রমে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছে। নিরঞ্জন চালের গুদাম ও সেবাশ্রমের ব্যবসার সব পরিচয় তুলে ধরলে পুলিশ ওদের হাতকড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উভয়ের দৃষ্টিতে এমন একটি ভাব ধরা পড়ে যে তাদের ছাড়া পেতেও অসুবিধে হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক সংক্ষিপ্ত—দুটি দৃশ্য, একটি লঙ্গারখানার, অপরটি চিকিৎসা কেন্দ্রের। প্রথমটিতে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল। এরই মধ্যে উপস্থিত কুঞ্জ রাধিকা ও অন্যান্য গ্রামের মানুষ। এদের কথাবার্তায় প্লাবনশেষে

*"About 50 per cent of the people are dying from starvation at present and about 40 per cent are living in semi-starvation, subsisting on herbs vegetables, and other inedible and undigestable food. People are also dying of cholera." (Quoted from 'Biplabi,' July 29, 1943–a weekly published from underground in and around Tamluk–Sutahata, Midnapur. Edited and Compiled by B.Chakraborty).

ফসলের প্রাচর্যের নানা গল্পকথা। একজন বৃদ্ধ ভিখারী শহর জীবনের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে সকলকে গ্রামে ফিরে যেতে বলে। কুঞ্জ রাধিকাও পোড়ামাটির শহর ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প নেয়। আর দ্বিতীয় দৃশ্য চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রধানকে দেখা যায়। এই চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন সাধারণ চিকিৎসারও আয়োজন নেই, চিকিৎসার নামে একরকম প্রহসন চলছে। এখানে প্রধানকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেখা যায়। দৃশ্যের শেষে বলা তার কথাটি "ভুলে যাও তোমার ব্যথার কথা" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য, প্রথমটি বেশ বড়। ঘটনাস্থল আমিনপুর। শহর থেকে ঘরে ফিরে আসা মানুষরা নিজ নিজ বাড়িতে উপস্থিত। নিরঞ্জনের উদ্যোগে, দয়ালের পরামর্শে প্রধানের বাড়িতে সকলে সমবেত হয়ে আগামী দিনের সম্ভাব্য সঙ্কট উত্তরণের জন্য পরামর্শে নিযুক্ত। নানা ধরনের কথাবার্তার শেষে সকলে সমবেত ভাবে খাটার সঙ্কল্পে নিজেদের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর মিলনের সুখময় পরিবেশ—ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলনের আবেগময় দৃশ্য রচনা করে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তারই সম্প্রসারিত রূপ—খেটে ফসল তুলে, ঝাড়াই-এর পর ধর্ম গোলায় কুঞ্জ হিসেবের বেশি ধান প্রথম জমা দেয়। ঠিক করে এবার নবান্ন উৎসব ধুমধাম করে করা হবে। সমাদ্দার পরিবারের বারবার মনে পড়ে প্রধানের কথা।

শেষ দৃশ্যে 'নবান্ন' এর উৎসব চলছে। গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকাল সমবেত হয়েছে। চলছে কৃষক রমণীর গান নাচ আর মোরগের লড়াই, গরুর দৌড়—জয় হল ফেকু মিঞার মোরগের আর রহমত উল্লার গরুর। অকস্মাৎ এই আনন্দোৎসবে প্রধানের আবির্ভাব। সে অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ হলেও সব বুঝতে পারে। সকলে মিলে জোর প্রতিরোধের সঙ্কল্প নেয়। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৪৮.৫ সারাংশ

'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'নবান্ন প্রকাশের পর ১৯৪৪-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। (১৯৩৯-৪৫)। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এসময়ের মধ্যে আগস্ট আন্দোলন হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতা-নেত্রী কারান্তরালে। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে চলছে সমস্ত দেশব্যাপী বিশেষ করে মেদিনীপুর অঞ্চলে শাসক ইংরেজদের সীমাহীন পীড়ন। জাপানী আক্রমণের ভয়ে দেশের ভিতর 'পোড়ামাটি নীতি' ঘোষিত হয়েছে। এই ৪২ আক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশ সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ও বন্যায় বিপর্যস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেশবাসীর জীবনে নিয়ে এসেছে মন্বন্তর। বাঙলাদেশের ১৫ লক্ষ মানুষ এসময় অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। জোতদার-মজুতদার এর সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার শোষণ করে; 'নবান্ন' সমাজের সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

'নবান্ন' এর বিষয়বস্তু গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষকের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষক জীবনের কথাই এর মূল প্রতিপাদ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় জোতদার-মজুতদারের ভয়ঙ্করতম শোষণ ও সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সব মিলিয়ে একটা সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশ এ নাটকের প্রেক্ষাপট।

এদিক থেকে 'নবান্ন'-এর বিষয়বস্তু অভিনব। মন্বন্তর তো শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, মারী-হাহাকার তার নিত্যসঙ্গী।

এই দুঃখ দুর্দশায় আমিনপুরের সমাদ্দার পরিবার তথা বাংলার বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ কৃষক পরিবার প্রাণধারণের প্রয়োজনে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে শহর কোলকাতার রুক্ষ পাষাণ প্রান্তরে আছড়ে পড়েছে। নাটকে তাদেরই জীবনবৃত্ত রূপায়িত হয়েছে। শহরের সম্পন্ন গৃহস্থ এই দুঃস্থ মানুষগুলির প্রতি যে নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে, তা উভয়ের শ্রেণীগত ভিন্নতার পরিচয় দেয়। এর প্রতিকার কামনায় বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলি সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিয়ে গাঁতায় চাষ ও ধর্মগোলার ব্যবস্থা করেছে। তারা জোটবদ্ধতার শপথ নেয়। এভাবেই নবান্ন হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।

৪৮.৬ অনুশীলনী ১

১। 'নবান্ন' নাটকের অভিনবত্ব সম্পর্কে অন্তত দুটি উদাহরণ দিন।

২। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয়ের তারিখ লিখুন।

৩। বাংলার কৃষক জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক ও তার নাট্যকারের নাম লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫।'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪৮.৭ 'নবান্ন' নাটকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আগস্ট আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠোর দমনপীড়নের বর্ণনা। এই সময় প্রধান হারাল তার সংগঠক স্ত্রী পঞ্চাননীকে। বন্যায় এবং হারু দত্তের অত্যাচারে হারাল নাতি মাখন এবং আমিনপুরকে। সমস্ত ঘর-গেরস্থালী ছেড়ে সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পার্কে ভিখারীর জীবন যাপন করতে থাকল। এখান থেকেই বিনোদিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল মূল দল থেকে। তারপর সরে গেল কুঞ্জ, রাধিকা; সকলকে হারিয়ে শহরের গোলোকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে প্রধানের পুনরায় প্রত্যাবর্তন ঘটল গ্রামে। এটাই নবান্ন নাটকের মূল ধারা। কিন্তু এই মূল ঘটনাবলী বর্তুল-আকারে ও প্রায় সংঘাতবিহীন ভাবে ঘটেছে। এর মধ্যে কারুণ্য থাকলেও কোনো দ্বন্দ্ব নেই এমনকি বৈচিত্র্য নেই বললেও চলে। অথচ মূল ধারা থেকে প্রথম যে শাখাটি বেরিয়ে এসেছে—বিনোদিনী যে অংশের প্রধান—স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে (মিলনটা অতর্কিত) যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে সেটা কিছুটা চমকপ্রদ। হারু দত্ত দুষ্ট প্রকৃতির, অত্যাচারী, তার অত্যাচারে প্রধান পরিবার গৃহহারা, দেশছাড়া। ধান চালের চোরাচালানকারী, মুনাফাখোর অসৎ চরিত্র, মেয়ে পাচারকারী, এক কথায় ভিলেন বা খল চরিত্র। কালীধন চালের ব্যবসাদার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ও যুদ্ধের বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফার ফাঁপানো ব্যবসা চালাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে সেবাশ্রমের ব্যবসাকেও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়েছে। এরা সবাই মুনাফা লুটছে, রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ফুলে, ফেঁপে একশা হয়ে গেছে। নাটকটি যদি এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাটক হত তাহলে দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটত। কেন না, এই অঙ্কের শেষে হারু দত্ত কালীধন স্বরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। বিনোদিনী নিরঞ্জনের সক্রিয় চেষ্টায় পুলিশের

হাতে ধরা পড়েছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে হারু দত্ত যে অত্যাচার চালিয়ে দর্শকমনে উষ্মার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল, দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে তাদের হাতে হাতকড়ি পরাতে পেরে নিরঞ্জন বিনোদিনী খুব তৃপ্তি পেয়েছে, সেই সঙ্গে দর্শকও খুশি হয়েছে এবং নিরঞ্জন বিনোদিনীর আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অত্যাচারিত হয়েছে যারা, প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যারা সেই কুঞ্জ রাধিকা, প্রধান এ সবের বাইরে থাকল। তারা এ সবের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারল না। তার ফলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা গুরুত্ব হারিয়ে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল মাত্র। সাধারণত, প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটকে ঘটনাক্রম অগ্রবর্তী হয় এই রকমভাবে—অত্যাচারীর অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তারপর তাকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং উদ্বোধিত শক্তির আঘাতে অত্যাচারীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর আর নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। নাটকের গঠনশৈলী তাহলে শিথিল হয়ে পড়বে। ঘনসন্নিবদ্ধ রূপটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 'নবান্ন' নাটক তারপরও এগিয়েছে এবং জনচিত্তে আলোড়ন তুলে জমজমাটি রূপটা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্রের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ। তিনি বলেন— 'নবান্ন' এর আগে আমাদের সব ট্রাজেডিই ডোমেস্টিক ট্রাজেডি। 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। এ নাটকে প্রধানের সংসার সেন্ট্রাল নয়। এর মধ্যে ছিল পোয়েট্রি অব মোমেন্টস। আমরা দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্য জুড়েছিলাম ওয়েলিং দিয়ে। হার্ট-রেনডিং 'ফ্যান দাও চিৎকার দিয়ে। র' রুডনেস থেকে পোয়েট্রি উঠে আসত। একটা দৃশ্যে কুঞ্জকে কুকুরে কামড়েছে। শোভা কুকুরকে লক্ষ্য করে ওয়াইলডলি শাউট করে তারপরই সফটলি বলে : জল খাবে? তেষ্টা পেয়েছে? মহর্ষি এই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, 'এটা শাশ্বত'।

আর এক জায়গায় বলেছেন—নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেকটার আছে। সম্পাদনায় একটু গোছানো হলেও, একটু সংহত হলেও সে কারেকটার বজায় রাখা ছিল। সম্পাদনায় দৃশ্যগুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে এক একটি এপিসোডের এক একটি ক্লাইম্যাকস প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আসে। প্রযোজনায় এই ক্লাইম্যাকসকে তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা ছিল। কলকাতায় আসার পর থেকে দুই দৃশ্যের মাঝখানে 'ফ্যান দাও', 'একটু ফ্যান দাও' এই আর্ত কোরাস নেপথ্যে শোনা যেত। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত পথেঘাটে এই আর্ত চীৎকার ভীষণভাবে শোনা যেত। দর্শকের কানে এটা টাটকা ছিল, দারুণ জীবন্ত ছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর 'নবান্ন' নাটক ক্রমঅগ্রবর্তী হওয়ার পক্ষে শ্রীশম্ভু মিত্রের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তাঁর বক্তব্যে প্রয়োগচাতুর্যের দিকটা গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। আমরা তাঁর বক্তব্য স্মরণে রেখে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাবলীকে একটু বিশ্লেষণ করে অন্য কিছুর হদিস পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করব।

নাট্যকার হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়াকে প্রত্যক্ষত জনশত্রু হিসেবে ধরেছেন ঠিক। কিন্তু তিনি তাদেরকেই বড় করে দেখাতে চাননি, মানে একমাত্র নেগেটিভ ফোর্স হিসেবে দেখিয়ে তাদের ধ্বংস করাটাই বড় কাজ বলে মনে করেননি। তিনি এদেরকে একটি ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সামান্য শত্রু বলে ধরে নিয়ে তাদের জন্য সৈন্যবাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ নিয়োজিত করে পরাজিত করতে চেয়েছেন। ঘটনাটা যেমন ভাবে ঘটেছে

তাতে এরকমটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান । কিন্তু তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়; নাটকের প্রধান প্রতিপক্ষ কে? নাটক মানেই সংঘাত। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংঘাতের ক্ষেত্র রচিত হয়। আর তার ফলে নাটকে এসে পড়ে একটি অনিবার্য গতিবেগ, তরতর করে নাটক ছুটে চলে। কিন্তু কালীধন, হারুদত্তের মতো প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষের পতনের পর নাট্যকার কাকে প্রতিপক্ষ করে পরবর্তী দুটি অঙ্ক পর্যন্ত নাটকে টেনে নিয়ে গেলেন—এ প্রশ্ন স্বভাবত না জেগে পারে না। নাট্যকার পৌঁছতে চান নবান্নের উৎসব দিনে, যে দিনটিতে সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং সকলের মিলনে উৎসব হয়ে উঠবে প্রাণ অপূর্ব রসে সঞ্জীবিত। এই উৎসব মুখর দিনে সকলে শপথ নেবে প্রতিরোধের, আকালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শপথ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রধান প্রতিপক্ষ কালীধন হারু দত্ত নয়, প্রধান প্রতিপক্ষ আকাল। এখন এই আকাল ব্যাপারটি কি একটু জানা দরকার। আকাল -এর আভিধানিক অর্থ দুঃসময়। যা মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় 'নবান্ন' রচনাকালে চলছিল এক চরম সঙ্কট। একদল মানুষের অর্থগৃধ্নুতা, শক্তির দম্ভ এবং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অশুভ বাসনা টেনে এনেছিল যে বিশ্বযুদ্ধ, তার ফলে বিশ্বের কতিপয় দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট। জনজীবন হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। গ্রামের সুস্নিগ্ধ জীবন প্রবাহে ঘটে গিয়েছিল অবাঞ্ছিত ছন্দপতন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় সমাজব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খলা করে তোলবার জন্য শোষক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধির ফলে এসে গেল আন্দোলন। তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়— তার ফলে দেশে দেখা দিল ভয়াবহ বন্যা। এই বন্যার দুর্বিপাকে মানুষ হয়ে পড়ল একান্ত অসহায়। মানুষের খাদ্যশস্য রাতের অন্ধকারে চলে যেতে লাগল ব্যবসায়ীর গুদামে। কৃত্রিমভাবে দুর্ভিক্ষকে তীব্রতর ও দীর্ঘতর করে তোলবার প্রয়াস পেলেন অসাধু ব্যক্তিবর্গ, তারা খাদ্যশস্যের অহেতুক অপচয় ঘটাতে লাগলেন নানা উপায়ে। এমন কি বস্তা বস্তা খাদ্যদ্রব্য গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার খবরও পাওয়া যেতে লাগল। এ সব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা। সব মিলিয়ে দেখা গেল দেশের বুকে একটা চরম দুঃসময় বিরাজমান অর্থাৎ আকাল এসে মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিতে লাগল। নাট্যকার সেই বিষয়গুলিকে একে একে তুলে ধরেছেন নাট্যাঙ্গিকে। এবং উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্মিলিত দুশ্চেষ্টায় জনজীবনে এসে পড়া আকালকে প্রতিপক্ষ করে তার বিরুদ্ধে প্রতি রোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকার। এই যে বিরাট শত্রু বা দৃশ্য নয় অথচ যার জঘন্য আত্মপ্রকাশ ঘটছে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবার জন্য, মানুষের সংসারের শান্তি, জীবনের সুখকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। যে শত্রু প্রত্যক্ষ এবং নাগালের মধ্যে তাকে শায়েস্তা করা যায় সহজে। তাই কালীধন, হারু দত্তেরা অতি সহজে ধরা পড়ে। তারা এতো সহজে এবং এতো সত্বর ধরা পড়ায় অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার অতি সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করবার ব্যবস্থা করে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করা যায়। কিন্তু যে শত্রু অপ্রত্যক্ষে থেকে সমাজের ক্ষতি করে যায়, প্রথমে তাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে। তাই এই আকালে সর্বস্ব হারিয়ে এই গ্রাম্য জনতা এটুকু বুঝেছে যে আর একটা আকালের প্রবেশের পথ বন্ধ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বিরাট প্রতিরোধ বাহিনী গড়বার দরকার আছে। তাই নাট্যকার একে একে আকাল সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তির

স্বরূপ উদঘাটন করে গেছেন প্রথম পর্যায়ে। তিনি দেখিয়েছেন কালোবাজারী, চোরাকারবারীদের চরিত্র, তিনি দেখিয়েছেন বস্ত্রহীন, শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়ের টুকরো পরিহিত ক্ষুধার্ত নগ্ন নরনারীর ছবি তুলে একদল অসৎ সংবাদজীবী এবং ফটোগ্রাফাররা পয়সার লোভে বিদেশের খবরের কাগজে তা বিক্রি করেছে, বিনিময়ে আর্ত জনতার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে দু-চার আনা পয়সা। নাট্যকার দেখিয়েছেন, যে যুদ্ধের ব্যাপক জনতার কোনো সম্পর্ক নেই সেই যুদ্ধ কার মঙ্গালের জন্য? যুদ্ধ কিসের জন্য এ বোধ যাদের নেই সেই সব মানুষদের ধরে ধরে যুদ্ধে সাপ্লাই করছে একদল অর্থলোভী কন্ট্রাকটর। তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের লালসা মেটাবার জন্য অসহায় ফুটপাত বাসী সোমত্থ নারীদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের বুক খালি করে। তিনি দেখিয়েছেন হাসপাতালের শোচনীয় ক্রিয়াকাণ্ড। সব মিলিয়ে দেশের একটা ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এসব দেখাবার উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করে তোলা। শুধু সচেতন নয় একটা প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলবার পজিটিভ ইঙ্গিতেও তিনি রেখেছেন তার নাটকে। আগামী দিনে আবার যদি আকাল আসে তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নাট্যকার সে কথা ব্যক্ত করেছেন দয়ালের মুখ দিয়ে, 'কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, সে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন ; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ!—এ প্রতিরোধ আকালের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ মূলক নাটকে তাই স্থান কাল পাত্রের সুসঙ্গাতি, ঘটনার যুক্তিসঙ্গাত বিন্যাস, ঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েন এবং তীব্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব সব সময় সঠিকভাবে পাওয়া যাবেই এমন কথা বলা যায়না। 'নবান্ন' নাটকে সে হিসেবে গঠনগত দিক থেকে অল্পস্বল্প ত্রুটি থেকে গেছে। নাট্য সমালোচকের চোখে সে ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা সহজেই পড়ে যাবে। কিন্তু 'নবান্ন' নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অন্য রকম ভাবে। গতানুগতিক নাটক আর গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য গণমঞ্চের নাটকের একটা স্পষ্টরেখ পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যসূত্রে নাটকে একটা বিপ্লবাত্মক বক্তব্য এসে পড়েই এবং আকস্মিকতার একটা সঙ্গাতিবিহীন চমক না থেকে যায়না। এ গুলিকে সমালোচনার খাতিরে শৈল্পিক ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন দৃশ্য পারস্পর্যবিহীন এক একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে। এই সব চিত্রগুলি যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হত তাহলে খুব ভাল হতো। নাটকের ঘটনাবলী একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলবে এবং প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখে একটা সংঘাত সৃষ্টি করে পরিণতি প্রাপ্ত হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা পূর্বের কথার জের টেনেও বলতে পারি গণনাটকের বিচার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতেই করতে হয়। প্রসঙ্গাক্রমে 'নীলদর্পণ'-এর কথাটা এসে পড়ে, আর নীলদর্পণে একটা প্রচারের দিক থাকা সত্ত্বেও নাটকটি অনেক বেশি নাট্যগুণসম্পন্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু ভাববার দরকার আছে। কেন না, 'নীলদর্পণ' প্রথমত গণনাটক নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের কথাই এই নাটকের একমাত্র বক্তব্য বটে তবে তারাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, তা যদি হত নবীন মাধব নায়ক আর তার পরিবারের বিষাদময় পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি এটা হতে পারত না। শিথিল অর্থে নাটকের মধ্যে যেটুকু ট্রেজেডির চেহারা দেখা গেছে, তা গোলোক বসুর পরিবারের ট্রেজেডি

হয়ে গেছে। সমস্ত কৃষক পরিবারের ট্রজেডি হয়ে উঠতে পারেনি।

তাহলে প্রশ্ন, 'নবান্ন' নাটকে কি সেই ট্রাজেডির কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে? বিষয়টা একটু ভেবে দেখে যেতে পারে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার এই নাটকের কেন্দ্রীয় পরিবার। এই পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই বেশি। নাটকে দৃশ্যত উদ্বাস্তু হয়েছে এই পরিবারটিই, এই গ্রাম্য পরিবারটির একটা বিপ্লবাত্বক ভূমিকাও আছে। প্রথম দৃশ্যে কুঞ্জ আর প্রধানের সংলাপ ,পরে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর প্রতিরোধমূলক ভূমিকা, আর তা করতে গিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই পরিবারের বৈপ্লবিক ভূমিকাটি তুলে ধরা হয়েছে। তারপর এই পরিবারটিই ভিখিরিতে পরিণত হল, এবং সমাপ্তি পর্বে আবার মিলনের বিন্দুতে সংস্থিত হল, সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই সমাদ্দার পরিবারটিই 'নবান্ন' নাটকের একটা ট্রাজিক বাতাবরণ তৈরি করেছে। আবার প্রধান সমাদ্দারের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা ভাববার একটুখানি সুযোগ থেকে যায় যে ব্যক্তি ট্রাজেডির একটি বুদবুদ। কিন্তু ব্যক্তির ট্র্যাজেডি হতে গেলে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিটিকে যে দৃঢ়ভূমির ওপর দাঁড় করান দরকার নাট্যকার তা করতে পারেননি। অপরপক্ষে চরিত্রটি গভীর থেকে গভীরতর তলদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বিষাদের ঘণীভূত রুপটা তার মধ্যে দেখা যায়নি। ফলে দর্শকমনে একযোগে ভয় ও করুণা জাগেনা। বরং পাগলামোর একটা হালকা আবরণ জড়িয়ে এবং কখনো কখনো আকস্মিকতা দোষে দুষ্ট করে চরিত্রটা তরল করে ফেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা অসংগত অবাস্তব পাগলামো প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও প্রধান অনেকটা 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের অতিনাটকীয় ভূমিকার শিকার। অনেকদিক থেকে উভয়ের মিল থাকলেও আসল কথা এই যে 'নবান্ন' নাটকের প্রধান পরিবার বা প্রধান চরিত্রটি সেন্ট্রাল নয়। গোটা সমাজের ছবিটা ফুটিয়ে তোলাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ডোমেস্টিক বা পারিবারিক ট্রজেডি সৃষ্টির কোনো ইচ্ছা নাট্যকারের এখানে ছিলনা। আগষ্ট আন্দোলন বন্যা-বিশ্বযুদ্ধ— এই তিন বস্তুর সমবায়ে আগত আকালের কবলিত হয়ে কৃষক সাধারণের জীবনে যে ছন্দপতন ঘটে গেছে, যে ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখদুর্দশা নেমে এসেছে তাতে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবনের চালচিত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্নের ওপর আকস্মিক আঘাত এসে গোটা সমাজের চেহারাটা দিয়েছে বদলিয়ে কোনো ব্যক্তি নয়, কোনো বিশেষ পরিবার নয়, সমস্ত কৃষক সমাজ সমস্ত গ্রাম্যজনতার জীবন দুঃখ, দুর্দশা হাহাকারে ভরে গেছে। শুধুমাত্র প্রধান সমাদ্দার বা তার পরিবারটাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের পথে ছেঁড়া কাপড় আর একপেট বুভুক্ষা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। সমস্ত কৃষক সমজই হয়েছে ক্ষতিগ্রত, তাই এই সব দিকে তাকিয়ে ব্যাপক অর্থে আমরা 'নবান্ন' নাটককে সামাজিক ট্রাজিডি মনে করতে পারি। তবে প্রসঙ্গাক্রমে বলে রাখা ভাল যে সঠিক অর্থে ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটক বাংলায় বিরল। না থাকবার কারণটাও অবিদিত নয়। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থায় ট্রাজেডি হতে পারেনা। আবার ব্যক্তির ট্রাজেডির জন্য যে ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের দরকার তেমন পুরুষ বিরল। এসব দিক বিচার করলে বলা যায় 'নবান্ন' নাটক ট্রাজেডির নাটক নয়। 'নবান্ন' ছোট ছোট ঘটনার, ছোট ছোট চিত্রের নাটক। 'নবান্ন' প্রতিবার প্রতিরোধের নাটক।

এই নাটক সম্পর্কে আরো একটু বলবার কথা এই যে, নাটকীয় চমক সৃষ্টির দিকে নাট্যকার অতিরিক্ত মনোনিবেশ করেছিলেন। নতুন বক্তব্য, জীবনবোধ নিয়ে ভিন্ন ধরনের দর্শক আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রযোজনা, সেক্ষেত্রে এ ঘটনা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। তার ফলে যে বিষয়-পরম্পরায় গোটা নাটকের

সন্ধিগুলো অগ্রগামী হয়ে নাটকের সুষম সমাপ্তি ঘটে, সে নিয়ম পরম্পরা সব সময় বজায় থাকেনি। বস্তুত নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য চমক বিশিষ্ট। প্রত্যেকটা দৃশ্যের শেষে অতর্কিত চমকসৃষ্টির একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাতে দর্শক সাধারণের উপভোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায় ঠিক কিন্তু তাতে গোট নাটকে যে উৎকণ্ঠা বজায় থাকবার কথা সেটি থাকেন। কালীধন ধাড়া হারু দত্ত পর্যন্ত একটা Dramatic Suspense বজায় ছিল। কিন্তু তাদের হাতে হাতকড়ি পড়বার পর নাটকে সে উৎকণ্ঠা আর বজায় থাকেনি। ফলত নাটকে গতিপ্রবাহের তীব্রতা সৃষ্টির পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি সমাজচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টার প্রতি একাগ্রতা লক্ষ্য করা গেছে।

৪৮.৮ 'নবান্ন' নাটকের গঠন

কোনো কাহিনীকে নাটক করে তুলতে গেলে গোটা কাহিনীকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে হয়। সাধারণত পাঁচটি ভাগে এই স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে । নাটকের পরিভাষায় একে বলা হয় পঞ্চসন্ধি। একটি পূর্ণাঙ্গ বড় নাটকে এই পাঁচ স্তর বা পঞ্চসন্ধির কড়াকড়ি নিয়ম নিয়ে কাহিনীকে নাটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সর্বাধুনিক বাংলা নাটকের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মে নাটক গ্রন্থিবদ্ধ হত। কিন্তু আধুনিক নাটকে এই নিয়মের কড়াকড়ি থাকল না। নাটক আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে আসবার ফলে আধুনিক নাট্যকারগণ গোটা নাটকটিকে তিনটিকে স্তরে ভাগ করে নিলেন। এই স্তর বিন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণের কারণটা অনুসন্ধানটা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। গ্রীক নাটকে গুরুত্ব পেত বিষয়বস্তু। তাই গ্রীক নাটককে বিষয় প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বিষয়টা প্রধান হলনা। প্রধান হল চরিত্র। এই ধারা বয়ে চলল দীর্ঘদিন। বাংলা নাটকের যে যুগটাকে স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ গিরিশ-অর্ধেন্দু-শিশির-অহীন্দ্র যুগ পর্যন্ত নাটকে প্রধান হয়ে দেখা দিল চরিত্র। যার জন্য প্রায় প্রত্যেকটা নাটকে এমন একজন চরিত্র অঙ্কিত করা হতে থাকল যাতে অভিনয় করবেন কোনো প্রতিষ্ঠিত নট বা নটী। তাদের অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে নাটকের সাফল্য ছিল নির্ভরশীল।

আধুনিক কালের বাংলা নাটক দুটি ধারায় বয়ে চলে। একটিতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় থাকে। অপর ধারাটি গণনাটকের খাত বেয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি, যে গণচেতনা সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করবে— সেই দিকে এগিয়ে যায়। গণনাটকে তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রিত রুপেই পরিবর্তন ঘটে গেল। নাটকে এসে গেল শোষক শোষিতের সংঘাত মুখর সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব। তাই ব্যক্তিরই হোক বা মনস্তত্ত্বেরই হোক একক প্রাধান্য বজায় থাকল না। প্রধান হয়ে উঠলো গোটা সমাজ। সমাজে একক ব্যক্তির ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। তাই ব্যক্তি প্রধান্যের স্থলে সমষ্টি প্রাধান্য সাব্যস্ত হল। সমষ্টি বলতে এখানে বলা হচ্ছে শোষিত গোষ্ঠী। শোষিত গোষ্ঠীর সংখ্যা বিপুল, তাই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা বলবার জন্য গণনাটক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তাই গণনাটকে আমরা দেখলাম প্রতিরোধ আর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। তাই এই ধরনের নাটককে বলা হয় প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest।

'নবান্ন' নাটক Drama of Acceptance বা Interjection অথবা Discomfort নয়, অথবা Frustration কিংবা Drama of Chaos অথবা Absured- ও নয়। 'নবান্ন' প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের

নাটক,Drama of Protest বা Drama of Revolt বলা যেতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মনোভাবটাই এই নাটকের মূল সেন্টিমেন্ট। সুতরাং এই নাটকে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের বক্রগামী রেখাচিত্রের শিল্পসম্মত রুপায়ণ মূল লক্ষ্য নয়, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলে জনগণকে প্রতিবাদের স্তরে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আর তারপর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত মুক্তির শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করবার পজিটিভ ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে নাটকটির অভীষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। 'নবান্ন' নাটক এই ধ্যানধারণার সরিক।

সুতরাং এই ধরনের নাটকের স্তর-বিন্যাসেও অনিবার্য ভাবে এসে যায় কিছু অদল বদল। নাটকের গতানুগতিক ঠিকুজি-কুষ্ঠিটা ছিঁড়ে যায়। নাটক যেহেতু প্রত্যক্ষ জীবনের রণক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, তাই তার সুরটা হয় চড়া। চড়া সুরকে দীর্ঘতর করলে অনুচিত ফলের সম্বাবনা দেখা দিতে পারে, তাই নাট্যকার পাঁচটি স্তরের পরিবর্তে কেউ তিনটি,কেউ চারটি স্তরে সমস্ত নাটকটি বিন্যস্ত করেন। একেবারে ছোট নাটক তিনটি স্তরে। একটু বড় নাটককে চারটি স্তরে ভাগ করে নিয়ে নাটক গড়ে তোলবার আধুনিক ইচ্ছাটাই অধিক কার্যকরী হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'নবান্ন' নাটক বড় নাটক, তাই এই নাটকটি চারটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের উৎসমুখ উৎসারিত হয়েছে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। প্রথম অঙ্গের প্রথম দৃশ্যে দেখান হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলন আর তার ফলস্বরুপ আমিনপুর গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি। তারপর দেখান হয়েছে প্রধান পরিবারের সাংসারিক জীবনযাত্রা এবং অনতিবিলম্বে বন্যার ভয়াবহ আক্রমণে গোটা আমিনপুরের সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র। সেই সঙ্গে মহামারীর ব্যাপক আক্রমণে সহায়সম্বলহীন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে, খাদ্যাভাবের সংগ্রামের চিত্র। এরই সঙ্গে অসৎ ধনীর অর্থগৃধ্নুতা, লোলুপতার নগ্ন চিত্র অঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকল বীভৎসভাবে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা; ঘর বাড়ি মানুষজন জীব জন্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত আমিনপুরকে সমুদ্রে পরিণত করে ফেলেছে। ....সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা! তার পরের দৃশ্যে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাবে এবং রোগ অসুখের চিত্র অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত। তারপরের দৃশ্যে পয়সাওয়ালা মানুষের জমি আত্মসাতের অপকৌশলের, লোলুপ দৃষ্টির অবলেহনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যে সমাদ্দার পরিবার, হারু দত্ত ও তার লোকজনদের নির্মম অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শহরে। এই দৃশ্যেই ঘটেছে মাখনের মৃত্যু।

নাটক এরপর উঠতে থাকে ওপরে। দ্রুতগতিতে রাইজিং এ্যাকসনের স্তর ছেড়ে ক্লাইমেক্স-এর স্তরে পৌঁছতে চায় নাটক। প্রথম দৃশ্যে নারীর ইজ্জত রক্ষা দেশে সঙ্কটত্রাণ সাম্রাজ্যবাদীর পাশবিক শক্তির ব্রিটিশ দমননীতির বিরুধ্বে সংগ্রাম বস্তুত কেড়ে নিল পঞ্চাননীকে। তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা নিল প্রধানের প্রতিবেশী দয়ালের স্ত্রী এবং তার একমাত্র সন্তানকে রাঙা, রাঙার মা। কিন্তু তবুও আমিনপুরের মনোবলটা ভেঙে পড়েনি। তবুও উনানের ধোঁয়া উড়ল। শাকপাতা সেদ্ধ করে মানুষগুলো বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগল আপন বাস্তুভিটার মাটিটুকু আঁকড়ে। তবে খেত-খামার খাল-বিলের শাকপাতা জগডুমুর আর কুচো কাঁকড় দিয়ে কদিনেই বা চলে, আর ওই বস্তুগুলো অত অপর্যাপ্তই বা কোথায়! তাছাড়া ঘাসেরও দাম বেড়ে গেছে

দুর্ভিক্ষের বাজারে। ‘এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করেছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।’[হারু দত্ত : ১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] প্রধান ঠিক করে জমি বিক্রি করবে। হারু দত্তের সঙ্গে কথা পাকা করে ফেলেছে শুনে বাধা দেয় কুঞ্জ। তার কাছে বাধা পেয়ে প্রধান মত বদলিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যেই চালের চোরাচালানদার হারু দত্ত এসে পড়ে ঘটনার কেন্দ্রে। কুঞ্জর সঙ্গে শুরু হল ঘাত-প্রতিঘাত। কুঞ্জকে প্রধান প্রতিবাদী হিসেবে ঘরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুরের মতো লাঠিপেটা করল। প্রধান বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকেও রেহাই দিলনা। সমাদ্দার পরিবারের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল দস্যু হারু দত্ত তার দলবল নিয়ে। হারু দত্তের অতর্কিত আক্রমণের অভিঘাতে বালক মাখনের মৃত্যু ঘটল। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখেমুখে নেমে আসল ‘একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া’।

‘নবান্ন’ নাটকের মুখ্য ঘটনা এটাই। এরপরই সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পাড়ি দেয়। অলি-গলিতে পথে পার্কে ঘুরে ঘুরে ভিখিরির জীবনযাপন করতে থাকে। প্রধান সমাদ্দার হয়ে যায় উন্মাদপ্রায়। এরপর কাহিনী কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। একদিকে অঙ্কিত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ছবি। তুলে ধরা হয়েছে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের অর্থ উপার্জনের নোংরা পথ অবলম্বনের চিত্র। তুলে ধরা হয়েছে অসহায় অভাবগ্রস্ত যুবতী মেয়েদের কেনাবেচার চিত্র। পথে পার্কে অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার বিবরণ রাখা হয়েছে এই নাটকে।

বিনোদিনীকে এমনিভাবে কাজের লোভ দেখিয়ে এক দালাল তুলে এনে কালীধনের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখানে বিনোদিনী মিলিত হয় নিরঞ্জনের সঙ্গে। কালীধন অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে সংগ্রহ করে অল্প পয়সার বিনিময়ে। ‘সেবাশ্রম’ নামক একটা জায়গায় তাদের লুকিয়ে রাখে। কালীধনের আরো একটি কারবার আছে। সে চলের মজুতদার। অল্প মূল্যে চাল কিনে গুদামজাত করে রাখে বেশি পয়সায় বিক্রি করবে বলে। তার গুদামে চাল এবং সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে হারু দত্ত ও টাউটের মত ঘৃণ্য মানুষজন. নাট্যকার কালীধন-হারু দত্ত নিরঞ্জন-বিনোদিনীকে নিয়ে একটি এপিসোড তৈরি করেছেন। এই অংশের পরিণতি ঘটিয়েছেন এইরকম ভাবে যে, সেবাশ্রমে আশ্রিত বিনোদিনী নিরঞ্জনের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মিলিত হয়। সেবাশ্রমের সমস্ত গুপ্ত বিবরণ সে তাকে দেয়। নিরঞ্জন সমস্ত শুনে থানায় যায়। কালীধনের চালের গুদামের বিবরণ এবং সেবাশ্রমের বে-আইনী ব্যবসার কথা ফাঁস করে দিয়ে দারোগাকে ডেকে আনে। দারোগা বামালসমেত কালীধন, রাজীব ও হারু দত্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর নিরঞ্জন বিনোদিনী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। পুনরায় আমিনপুরের পরিচিত মাটির কোলে ফিরে আসে, নিজেদের বাস্তুভিটেতে আবার নতুন করে ঘর তোলে।

কুঞ্জ রাধিকা প্রধান তখনও শহরের পথে ভিখিরি জীবনযাপন করতে থাকে। নাট্যকার শহরের অলিগলিতে ঘুরিয়ে শেষে তাদের নিয়ে আসে এক বড়লোকের বাড়ির সামনে। উদ্দেশ্য একটা বৈপরীত্যপূর্ণ ছবি তুলে ধরা। অর্থাৎ একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের অ-মানুষিক জীবনযাত্রার ছবি অঙ্কন করা আর তার পাশাপাশি ধনী মানুষের বিলাস-বৈভবের চিত্র, অকারণ অপচয়ের চিত্র তুলে ধরা। সেই সঙ্গে

কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত দেশের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের চরিত্র উদঘাটন এবং এ সমস্তের পাশাপাশি ধনের সঙ্গে ধনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে নিরন্ন গরিব মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক কত আন্তরিক, হৃদ্যতাপূর্ণ, প্রেমপ্রীতির বন্ধন কত নিবিড় তা দেখান হয়েছে। মানুষ যে অবস্থার ফেরে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থানে রত, জন্তুর জীবনযাপনে বাধ্য, কিন্তু তবুও তাদের অন্তঃকরণ মানবিক গুণসমৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়ে নাট্যকার কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্যদিকে।

এই দৃশ্যের পর সমাদ্দার পরিবার আবার দুটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যায় কুঞ্জ রাধিকা, আর একদিকে যায় প্রধান সমাদ্দার। কুঞ্জ রাধিকা এসে পড়ে শহরের এক লঙ্গারখানায়। এখানে এসে তার সমবেত ভিখিরিদের কথাবার্তার মধ্যে আমিনপুরের ফিরে যাওয়ার প্রেরণা পায়। অতঃপর আমিনপুরের পথে পা বাড়ায়, 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' অপর দিকে দল থেকে বিশ্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে একটা হাসপাতালে। তার চোখ দিয়ে নাট্যকার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থার চরম দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। এর পরে প্রধান কোনো দুর্জ্ঞেয় প্রেরণাবশে আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন করে নাটকের শেষাংশে।

অতঃপর নাটক চলে আসে পুনরায় আমিনপুরে। নবান্নের উৎসবে সকলে মিলিত হয়।

উপরোক্ত কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, 'নবান্ন' নাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ, সেই সঙ্গে আছে আকর্ষণীয় নাটকীয় উৎকণ্ঠা। প্রতি দৃশ্যে চমক, চমকের পর চমকে নাটকটি জমজমাটি। নাটকটির চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কেও পাঁচটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি এবং চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। অতএব চারটি অঙ্কে মোট দৃশ্য সংখ্যা পনেরটি। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে আমিনপুর গ্রাম। দ্বিতীয় তৃতীয় অঙ্কের সাতটি দৃশ্য শহর। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য পুনরায় আমিনপুর। সব মিলিয়ে আমিনপুর গ্রাম পেয়েছে আটটি দৃশ্য, শহর পেয়েছে সাতটি দৃশ্য। এদিক থেকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় থেকেছে বলা যেতে পারে। আট আর সাতে পনেরটি দৃশ্যের স্তরে স্তরে নাট্যকার সঞ্চারিত করে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত নাট্যরস। যে রস দর্শক সাধারণকে জমিয়ে রাখবার জন্যে যথেষ্ট। শম্ভু মিত্র এই নাটকের সম্পাদনা, অভিনয় এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন 'নবান্ন' এ ছিল একটা এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেক্টার আছে। দৃশ্যগুলি এমনভাবে বাঁধা যে, এক একটি ক্লাইম্যাক্স, প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আছে। সুতরাং নাটকটি যে খুব জমজমাট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে প্লট গঠনে শৈথিল্য খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়।

৪৮.৯ সারাংশ

বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে 'নবান্ন' রচনা, প্রকাশ ও অভিনয় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। এর পেছনে সক্রিয় ছিল একটি নতুন ভাবনা, বাংলা সহিত্য সংস্কৃতি জগতে অপেক্ষাকৃত নতুনতর রাজনৈতিক দর্শন। মানুষের কথা, মানুষের কাছে, তাদের ভাষায়, তাদের বোধের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্কল্প থেকে

'নবান্ন' নাটকের সৃষ্টি। এই নাটকে সমকাল ও ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও 'নবান্ন' নাটককে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক হিসাবে গণ্য করা হয়। এ নাটকের মূলধারার আবর্তন ঘটেছে প্রধান সমাদ্দার-এর পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রধান পুত্রদ্বয় শহীদ শ্রীপতি-ভূপতি, পত্নী পঞ্চাননী, বড় ভাইপো কুঞ্জ ও তার স্ত্রী রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিনোদিনী ও তার স্বামী নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র। অথচ এই দুটি চরিত্রই নাটকের দুষ্টের দমন—এই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—চোরাচালান, মেয়ে পাচারকারী হারাধন ও মজুতদার ও নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধনকে ধরিয়ে দিয়ে সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। Suffering and Struggle-এর মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির এটি যদি কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক বিধান হয় প্রধান-কুঞ্জ সেক্ষেত্রে অনেকটাই অতি সাধারণ দুর্বল চরিত্র মাত্র। যদিও এ নাটকে সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতার তারা শিকার, তাদের জীবন যন্ত্রণাই সর্বাধিক প্রতিফলিত। কিন্তু এদের বাঁচবার আকাঙ্খাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সম্ভবত এই শেষোক্ত কারণেই—শত হতাশার মধ্যেও বাঁচবার আকুলতা মানুষের জীবনে গভীরতর সত্য বলে বিষয়বস্তু অভিনয় নৈপুণ্য ও সংলাপ নাটকটিকে সেদিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নবান্ন গণনাট্য হিসেবে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। কারণ নাটক দেশকালের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গণচেতনার সঞ্চারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের চতুর্দশ-পঞ্চদশ দৃশ্যে, পরিশেষে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান চাষী জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ভুলে সকলে মিলেমিশে ফসল একই খামারে তোলা, ঝাড়াই-এর পর তার একটি অংশ অনাগত ভবিষ্যৎ দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধর্মগোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন করেছে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মরা গঙ্গার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে।

নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে স্মরণ করতে হয়, নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসঙ্গটিও। নাটক সাধারণত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক সাধারণত পাঁচটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথমে নাটকীয় ঘটনার প্রস্তাবনা বা সূচনা বা এক্সপোজিশন, দ্বিতীয়ে তার ক্রমবির্বতনের প্রথম ধাপ আরোহপর্ব বা রাইজিং অ্যাকশন, পরে নাটকের চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্ত (crisis) বা ক্লাইম্যাক্স-এর পর একটি পরিণতির দিকে অবরোহ, অবনমন বা ফলিং অ্যাকশন এবংনাটকের পরিণতি পর্ব বা ক্যাটাসট্রফি/ ডেনোমেন্ট—পূর্ণাঙ্গ বড় নাটক এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে সমাপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক নাটক যুগ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিষয় ও চরিত্র প্রাধান্য সূত্রে নাট্যাভিনয় ও নাটকের গঠন বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাহিনী নির্ভর চরিত্র নাটক, নাটকের ভরকেন্দ্র পরিবর্তন করেছে। সেক্সপীয়রীয় নাটকে চরিত্র বিকাশের জন্য যে গঠন প্রয়োজন ছিল, গিরিশ-অর্ধেন্দু-দানীবাবু-অহীন্দ্র যুগে আবেগপ্রবণ চরিত্রাভিনয়ে যে দর্শককে আবেগতাড়িত করবার জন্য নাটকের বিস্তার প্রয়োজন ছিল, পরবর্তীকালে যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশের জন্য দ্বন্দ্বসঙ্কুল মূহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে সেই পরিসরের প্রয়োজন নেই, তাই পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত আবেগসর্বস্ব চরিত্রাভিনয়ে ভাটা পড়ায় আধুনিক নাটক ক্রমশ তিন অঙ্ক থেকে একাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যুগের প্রধান চরিত্রগুলি ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর এবং সমস্ত নাটকে ঘটছিল মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য। ঠিক এরই পাশাপাশি আরও একটি ধারা যুক্ত

হল চারের দশকে, গণনাট্যের সূচনাপর্ব থেকে। এ নাটকে ব্যক্তি নয়, ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রাধান্য। আর এই সমষ্টি ভাবনার জন্যই গণচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নাটক ব্যবহার করা হয়। গণনাটকে তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্বের যোগ দেখা যায়। গণনাটকে শোষকদের সঙ্গে শোষিতের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই সংঘাত থেকেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। নবান্নে বহু মানুষের সমর্থনে দাঁড়িয়ে নাট্যকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের, সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন।

উচ্চকণ্ঠ হয়ে এই বক্তব্য দীর্ঘ সময় জুড়ে বলা যায়না। তাই নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কের পরিবর্তে চার অঙ্কে মোট পনের দৃশ্যে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। অকুস্থল মেদিনীপুর, আমিনপুর একটি কল্পিত গ্রাম হলেও, সমকালীন বহু বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ নাটক রচিত। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাস, মন্বন্তর-মহামারী, মড়ক—এরই মধ্যে কিছু মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। দুঃখ, দুর্যোগের অবসানে, সকলে মিলে সব দুঃখ সয়েও, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কট উত্তরণের জন্য ধর্মগোলার সঙ্কল্প নিয়ে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের চরম মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স বলে যদি কোনো কিছু কল্পনা করা হয় তবে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে গ্রামসমাজের অত্যাচার অনাচারের নায়কদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থার পর তৃতীয় অঙ্কের সামান্য দুটি দৃশ্যে লঙ্গরখানা ও চিকিৎসাকেন্দ্রের অব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নাটকের উপসংহার টানা হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। নবান্নের কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, এনাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। এটি জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। এর প্রায় প্রতিদৃশ্যে আছে চমক। পনের দৃশ্যের মধ্যে আটটি দৃশ্যে আমিনপুরে, আর সাতটি শহরে সংঘটিত। গ্রাম-শহরের দৃশ্য সমাবেশ করে নাট্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে স্তরে স্তরে নাট্যরস সঞ্চারিত করেছেন। প্রথম পর্বের অন্যতম নাটক পরিচালক ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র। নবান্ন নাটকের মহাকাব্যিক (এপিক) ব্যাপ্তি এপিসোডিক ক্যারেকটার পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। ফলত নাটকটি যে অভিনয়ে খুবই জমে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৪৮.১০ অনুশীলনী ২

১। নিচের সংলাপগুলি পড়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন :

(ক) প্রধান। চলো চলে যাই।
দয়াল। কোথায়?
প্রধান। কোন শহরে? অন্নকুট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।
—বক্তা কেনে পরিস্থিতিতে, কেন এবং কোথায় যাওয়ার কথা বলেছেন? ‘অন্নকূট’ শব্দটির বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থ বুঝিয়ে দিন।

(খ) “চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।”

—বক্ত কে? কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) "আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—" —বক্তা কে? কুঞ্জকে একথা বলার কারণ কী?

(ঘ) "আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।"—বক্তা কে? কাদের বলেছেন? আমিনপুরের কলঙ্ক বলবার কারণ কী? বক্তার চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। "নবান্ন' নাটকের গঠনগত বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৩। 'নবান্ন একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।'—মন্তব্যটির সারবত্তা স্থির করুন।

৪। বিষয়বস্তু, উপস্থাপক ও চরিত্র পরিকল্পনায় 'নবান্ন' অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।— মন্তব্যটি কতদূর যথার্থ আলোচনা করুন।

৫। 'নবান্ন' সমকালীন সমাজ ও নাট্য আন্দোলনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেও, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দুর্বল। — এ সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করুন।

৪৮.১১ 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র আলোচনা

একটি নাটকের জন্য কাহিনী, সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। নাটকে চরিত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুবই সীমিত। একটি বা দুটি চরিত্র দিয়ে একটি নাটকের সাবলীল গঠনকার্য সমাধা হতে পারে।

বাংলা অপেশাদার গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'নবান্ন' কিন্তু এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'নবান্ন' নাটকে ছোট বড় চরিত্র মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা চরিত্র। আমরা এখানে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপিটা তুলে দিলাম :

প্রধান সমাদ্দার	আমিনপুরের বৃদ্ধচাষী	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার	প্রধানের ভাইপো	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্দার	কুঞ্জের সহোদর	জলধর চট্টোপাধ্যায়
মাখন	কুঞ্জর ছেলে	মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)
দয়াল মণ্ডল	প্রতিবেশী	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত	স্থানীয় পোদ্দার	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	চাল ব্যবসায়ী	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব	কালীধনের সরকার	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর	জনৈক চাষী	রঞ্জিত বসু
যুধিষ্ঠির	আন্দোলনকারী	নীহার দাশগুপ্ত
ফটোগ্রাফারদ্বয়	সংবাদপত্রের প্রতিনিধি	অমল ভট্টাঃ, রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	চাল খরিদ্দার	মনোরঞ্জন বড়াল

বরকর্তা	বড়কর্তা	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখারি	—	গোপাল হালদার
ডোম	—	শম্ভূ হালদার
দারোগা	—	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	—	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	—	অজিত মিত্র
ফকির	—	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী	প্রধানের স্ত্রী	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা	কুঞ্জর স্ত্রী	শোভা সেন
বিনোদিনী	নিরঞ্জনের স্ত্রী	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা	হারু দত্তের মা	
ভিখারিণী	—	বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা	—	ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু, টাউট, ভিখারী, হারু দত্তের শালা, কনেস্টবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দরের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি।

চরিত্রলিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা অনেক। এতো চরিত্র সংখ্যার পিছনের কারণটা অবশ্য এই নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা। বিষয় বৈচিত্র্য, সময়দীর্ঘতা এবং প্রেক্ষাপটের বিস্তীর্ণতা প্রভৃতি হেতু নবান্ন নাটকের চরিত্রলিপিও বিরাট হয়ে গেছে। একই সঙ্গে আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছে নাটকে। গ্রাম ও শহরের চিত্র, সমাজব্যবস্থার চরম দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি তুলে ধরে একটা প্রতিরোধমূলক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে গেলে যেমন নাটককে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিছিয়ে দিতে হয়, সেইরকম সর্বস্তরের সুচারু নাট্য রুপায়ণ করতে গেলে চরিত্র সংখ্যাবৃদ্ধির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে, নাটকে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট ও ব্যপকত্বের পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি তুলে ধরবার প্রয়াসটা লক্ষিত হয় বেশি।

'নবান্ন' নাটকে বড় চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেওয়া গেল। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ সমাদ্দার, নিরঞ্জন সমাদ্দার, দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া, রাজীব। স্ত্রী চরিত্রগুলি যথাক্রমে রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী। একটিমাত্র শিশু চরিত্র মাখন। নাটকে এদেরই ভূমিকাংশ বেশি। এরাই নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। এদেরই অভিনয় নৈপুণ্যের দৌলতে নাটক দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নাটকে সুবিস্তৃত। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ ও নিরঞ্জন সমাদ্দার, রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী এবং মাখন এক পরিবারভুক্ত। দয়াল প্রতিবেশী, হারু দত্ত, কালীধন চোরাকারবারী ও চোরাচালানদার। রাজীব কালীধনের সরকার। মূলত এই চরিত্রগুলোকে বিকশিত করবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য, পরিণতি প্রদর্শনের জন্য নাটকের অপরাপর চরিত্রগুলো রুপায়িত

হয়েছে।

নাটকে সাধারণত তিন ধাঁচের চরিত্র দেখা যায়। ফ্লাট চরিত্র, রাউণ্ড চরিত্র, টাইপ চরিত্র। ফ্লাট চরিত্র বড় কিন্তু আগাগোড়া একঢালা। একই রকমভাবে চলতে থাকে। অন্তর জগতের উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইত্যাদির গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত আকুলতা ব্যাকুলতার টানাপোড়েনের রেখচিত্র অঙ্কিত না করে সরলরৈখিক ভাবে চলতে থাকে। এ ধরনের চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। রাউণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। অর্ন্তদ্বন্দ্বে এবং বহির্দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে আন্দোলিত। নাটকে সাধারণত নায়ক চরিত্র এই শ্রেণীতে পড়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয় এই ধরনের চরিত্র। নবান্ন নাটকে কুঞ্জ এই রাউণ্ড চরিত্রের মধ্যে পড়ে।

প্রধান সমাদ্দার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে যখন উপস্থিত হয় তখনই তার বার্ধক্য অবস্থা। কিন্তু সেই বয়সেই তার ভেতরে একটা আগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার দুটি পুত্র ছিল, শ্রীপতি ভূপতি। বৃদ্ধা স্ত্রী পঞ্চাননীর পুত্র এই দুটি মৃত। মৃত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে প্রধান সমাদ্দার হত্যা ও সন্ত্রাসবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে দুর্দান্ত আবেগে ভরপুর। এরই মাঝে সে অঙ্কন করেছে অনাগত দিনের রক্তিম চিত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্তি তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র কুঞ্জর চোখে সেটা এড়িয়ে যায়নি। অসংলগ্ন কথাবার্তা, অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অসংযত পরিকল্পনা কখনো কখনো প্রাণ দেওয়ার পাগলামো ব্যাকুল কথাবার্তায় কুঞ্জ ঠিকই ধরেছে ‘শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটো ছেলের শোকে।’ পুত্রদুটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত, কিন্তু সর্বব্যাপক আন্দোলন ও তাকে দমন করবার জন্য সর্বনাশা অত্যাচার ও নির্যাতনে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হওয়াতে সে সম্বলটুকু চলে গেল। সর্বনাশা ঘাত-প্রতিঘাত কেড়ে নিল দুই পুত্র। তিন মরাই ধান নষ্ট হয়ে গেল। পঞ্চাননী প্রাণ দিল। এরই মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসার এবং নাতি মাখনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল যেটুকু জমি জায়গা আছে তার ওপর ভর করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর এবং সর্বনাশা বন্যা এসে স্বপ্নের শেষাংশটুকু কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর এলো চোরাচালানদার হারু দত্তের আক্রমণ। অপদস্থ হল গ্রামের মাতব্বর গোছের প্রধান সমাদ্দার। এরই ভেতর ঘটল মাখনের মৃত্যু। ছাড়তে হল গ্রাম। শহরের পার্ক ও ফুটপাতকে আশ্রয় করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হল তাকে। একের পর এক এবম্বিধ দুর্ঘটনায় প্রধান সমাদ্দার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

গ্রামের এই সরল সাদাসিধে মানুষটি যার অভ্যন্তরে এক প্রতিরোধপরায়ণ প্রতিস্পর্ধী সাহসিকতার অপর্যাপ্ত সঞ্চয় ছিল,যা তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত লাভা স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে, ‘চল্‌তো গাও বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।’ কিন্তু তারপর থেকে চরিত্রটা কেমন এক অহেতুক অসহায়তার কবলে আত্মসমর্পণ করে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পরিবর্তে অসংযত পাগলামোর খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হল। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে প্রথম অঙ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম দৃশ্যে। হারু দত্তের লোকজন যখন কুঞ্জকে লাঠিপেটা করছে তখন প্রধানের বুকের ভেতর স্তুপীকৃত বারুদের বিস্ফোরণ ঘটবার পরিবর্তে আত্মরক্ষার অসহায়তা ফুটে উঠেছে, ‘মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।’ প্রথম দৃশ্যের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দর্পিত বীরত্বের একটুখানিও যদি দেখা যেত

তাহলেও চরিত্রটা সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারতো। আর তার পরের পরিবর্তনটাকে আমরা এইভাবে মেনে নিতে পারতাম যে বিপর্যয়ের আতিশয্যবশত চরিত্রটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে তার চরিত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে তীব্র সচেতনতা, 'কী কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকী কান্না! আমার সহানুভূতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই! তুই আমারে অপমান করলি —'[১ম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য] কিংবা, 'ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল! কিন্তু বড়ে ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত।' অথবা, 'ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।'[১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য] সংলাপগুলো চরিত্রটার সচেতনতার দিকটি তুলে ধরে, গভীরতর উপলব্ধির তলদেশ থেকে উঠে এসেছে বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিক। পরের পর্বেই দেখা গেছে চরিত্রটি গতিপথ পরিবর্তন করেছে। আর গ্রাম থেকে শহরে এসে পড়বার পর চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়। পাগলামির ভাব বজায় আছে বটে এবং কখনো কখনো পাগলামো অবস্থায় কিছু কিছু প্রতীকধর্মী সংলাপ উচ্চারণ করে দর্শক মনে দাগ টানবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ঠিক, কিন্তু মনের জগতে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিচ্ছবি সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে এসে বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে চরিত্রটি যাতে রাউন্ড হয়ে ওঠে, তার এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে চরিত্রটি এক ঢালা হয়ে অসংযত চিন্তা ভাবনার খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। কোনো ভাবেই কখনোই গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ চরিত্রটার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু এই যত্ন সম্ভবত একটিমাত্র কলমের নয়। নাটকটি লিখিত হওয়ার পর, মনে হয়, সম্পাদনার সময় বহুজনের সযত্ন হস্তক্ষেপের ফলে এমনটি ঘটেছে, যা নাটকের মধ্যে খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়। বহু যত্নে সন্তানের যে অবস্থা হয় প্রধান সমাদ্দারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাই চরিত্রটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, টুকরো টুকরো মনে সযত্ন প্রয়াসের ফল হিসাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক যেন শান্ত নদীর বুকে মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে অল্প অল্প তরঙ্গের উত্থান-পতনের মতো হয়ে চরিত্রটা অতর্কিত ভাবে পরিণতির পর্বে এসে পৌঁছেছে। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় সমুদ্র গর্ভে যে ভয়াল ভয়ঙ্কর উত্তালতা সৃষ্টি করে মনের ওপর গভীর ও গাঢ় দাস টানে তেমন ভাবে চরিত্রটা গড়ে ওঠেনি। অথচ নাটকের বিষয়টা ছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ।

অপরপক্ষে, কুঞ্জ চরিত্রটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনের উষ্ম আবর্তের ওপর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। তার সংবহনতন্ত্রী তারুণ্যের তাজা রক্ত সুষম বন্টনের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্য বজায় থেকেছে। সে বুঝতে পারছে মারমুখী সন্ত্রাসবাজদের সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, তাই অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে প্রধানের প্রৌঢ় মনের দপ করে উদীপ্ত হয়ে ওঠাকে দমন করেছে, 'তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরই পালাই।'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] যদিও প্রধান এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল্, বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের; তা কুঞ্জ শোনো না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] এই বক্তব্য কুঞ্জর পলায়নবাদিতার

দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু কুঞ্জ সম্পর্কে এই কথাই যথেষ্ট নয়। হারু দত্ত প্রধানকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার সময় কুঞ্জ তীব্র প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করে তার বীরত্বের প্রমাণ রেখেছে,...........'জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।' প্রধান চুপ করতে বলায় সে দপ করে জ্বলে উঠেছে, 'কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচজন মানুষ জানুক।' হারু দত্ত ছোটলোক বলে গালাগালি দেওয়ায় কুঞ্জ মাথা ঠিক রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছে, 'এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।' 'এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।' কিন্তু হারু দত্ত যখন উত্তেজিত ভাবে প্রধানকে খচ্চর বলে গাল দিয়েছে, তখন কুঞ্জ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, দপ্ করে জ্বলে উঠেছে সে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—' বেগে প্রস্থান করে লাঠি হাতে প্রবেশ করেছে সে। হারু দত্তের লোকজনের সঙ্গে লড়াই করেছে সে জমি এবং মান ইজ্জৎ রাখতে। কুঞ্জ চরিত্রের এটাই প্রথম মাত্রা। কুঞ্জ ভীরু নয়, পলায়নী মনোভাবকে আশ্রয় করেনি, সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কুঞ্জ দুর্দান্ত শক্তিসম্পন্ন।

কুঞ্জ চরিত্রের দ্বিতীয় মাত্রা, কোনো ওপরওয়ালা নয়, ভাগ্য কিংবা ভগবান নয়, আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। কুঞ্জ কৃষক জীবন মন্থন করে যে সত্য তুলে এনেছে, তা হল—'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য] কুঞ্জ এই সত্যের শীর্ষবিন্দুতে একদিনেই আরোহণ করেনি। অতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্জন করেছে এই অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস মানুষের প্রাণ নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। অতি বাস্তব বন্যা গরিব মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে মানুষকে। অপরপক্ষে যারা নিরন্ন মানুষের মুখের খাবার আর অসহায় নারীর মান ইজ্জতের মূল্য না দিয়ে বেচাকেনার খোলা বাজার বসিয়েছে ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদের প্রতি সদয় এটা একটা লোকঠকানো ধুর্তুমি। তাই অত্যাচারী যখন সেই কথা স্মরণ করিয়ে শোষণকে অব্যাহত রাখতে চায় তখন দৃপ্ত প্রতিবাদের অগ্নি দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখে মুখে। বলে, 'তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] সুতরাং ওপরওয়ালা, ভাগ্য বা ভগবান নয়, মানুষের অত্যাচারী ভূমিকা এবং সেই মানুষের ভেতরই রয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অযূত সম্ভাবনা, নিযুত সাহসিকতা।

কুঞ্জ গার্হস্থ জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। প্রধানের পর সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সেই সুবাদে সে এই পরিবারের যুবরাজ। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত—এই নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মূলধন জমি, কিন্তু অভাবের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে সামান্য জমি এতগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে সরলরৈখিক পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। তাই অনিবার্যভাবে তার ঘর গৃহস্থালীতে এসে পড়ে ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদ। রচিত হয় মতানৈক্যের রোজনামচা। 'সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে।' [১ম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য] নিজের স্ত্রীর প্রতি এধরনের মন্তব্য করতে এই চাষাড়ে যুবরাজের এতটুকু দ্বিধা হয় না বটে কিন্তু ভাই নিরঞ্জনের গঞ্জনায় যখন ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীর চোখে জল ঝরতে দেখে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ফের মেরেছিস

বুঝি?..........বলি ফের আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের? পশু বলে গালাগাল দিয়ে একখানা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে হাত.....বেরো বেরো তুই, বেরো।' কিন্তু তারপর ভাই-এর রক্ত দেখে সম্বিত ফিরে পেয়ে আত্মগ্লানিতে ভরে যায় তার মন।'খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনরে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!' (১/২) কুঞ্জর যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের হাহাকারটা নাট্যমঞ্চ প্রবল প্রতিক্রিয়া সঙ্গে দর্শন করলে আমাদের মনে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি না করে পারেনা। সুতরাং গৃহকর্তা হিসাবে অভাবের আতিশয্যে যেমন সে নিজের সহধর্মিণীর সঙ্গে অন্যায় ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়, তেমনই পরিবারের অন্যদের দয়ামায়া স্নেহমমতার গাঢ় আলিঙ্গানে বেঁধে রাখতে চায়। এই যে প্রীতিপূর্ণ বন্ধনস্পৃহা—এটি কুঞ্জ চরিত্রের তৃতীয় মাত্রা।

কুঞ্জ শুধু নিজের সংসারটাকে ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়ে আবদ্ধ নয়। প্রতিবেশী সম্পর্কেও তার অন্তরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। কুঞ্জ বাইরে কঠিন, বাহ্যিক আচরণও খুব খানিকটা রূঢ়। কিন্তু রূঢ় কাঠিন্যের অভ্যন্তরে একটা নরম তুলতুলে জায়গা আছে, যেখানটা ঠিকমতো ঘা লাগাতে পারলে দরদর করে নিঃসৃত হবে অজস্র দয়ার নির্যাস। নিজের অভুক্ত পরিবারের জন্যে ঘটিবাটি বিক্রি করে যে ক'মুঠো চাল কিনে এনেছে তার দাবিদার পরিবারস্থ পাঁচজন ব্যক্তি। প্রধান সমাদ্দার সে কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেও ফেলে, 'শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?' (১/৩)কুঞ্জও কতকটা প্রধানের কথার প্রতিধ্বনি করে, 'রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকেলবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (১/৩) মুখে উচ্চারণ করলেও কুঞ্জর অন্তরের কথা তা নয়। তাই দয়ালের একমুঠো চালের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনা সে। শেষ সম্বলের থেকে কিছুটা চাল দয়ালকে দিয়ে নিজে খুব খানিকটা তৃপ্তি পায়। এই প্রতিবেশী প্রীতি কুঞ্জ চরিত্রের চতুর্থ মাত্রা।

কুঞ্জ গ্রাম্য এক কৃষক সন্তান। রাগ দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদের পাশাপাশি পরিবার এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এই কৃষক সন্তানের সব কথা নয়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত হতে হতে সময়ের গতিপ্রকৃতি কোন আবর্ত রচনা করতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গ্রাম্য জীবনে যে অনতিবিলম্বে নেমে আসবে এক হাহাকার তা তার দূরদর্শিতায় ধরা পড়ে। তাই সে অন্য সকলের মতো বিচলিত না হয়ে খুব সহজেই উচ্চারণ করে, 'বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হবে।'(১/৩)

কুঞ্জের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন অদৃষ্টদ্রষ্টা সাধুসন্তর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসন্ত এক বাস্তববাদী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই সত্য যে কতখানি নির্মম, নিষ্ঠুর তার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তারা গ্রামের মাটির কোল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে শহরের পার্কে, ফুটপাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভিখারী জীবনে সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়। (দ্রষ্টব্য ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) এক গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সময়ের গতি প্রকৃতি জীবনের ওপর যে অনিবার্য বিপর্যয় টেনে আনতে পারে সে সম্পর্কে দুরদর্শিতার ক্ষমতা কুঞ্জ চরিত্রের পঞ্চম মাত্রা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় কুঞ্জের ছোটখাটো একটা মর্যাদার আসন ছিল। পাড়াপড়শীরা সে আসনটা কেড়ে

নেয়নি। কুঞ্জও সে আসনের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আবার নিজের পরিবারস্থ সভ্যগণের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহমমতা ভালবাসার ঘাটতি ছিল না। একের পর এক বিপর্যয় প্রধানকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, সংসারে জ্যেষ্ঠ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে যথাযোগ্য কর্তব্যকর্মে অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, দুটি পুত্রকে হারিয়ে শোকের পৌনঃপুনিক বিলাপের শোককে গভীর হতে দেয়নি। কিন্তু কুঞ্জ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সংযত বিলাপে শোককে গভীরে নিয়ে গেছে। মতিভ্রান্ত হয়ে পুরো পরিবার—যারা তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেনি। কেন না, পুত্রশোকটা তার কাছে তত বড় হয়ে ওঠেনি, যত বড় করে দেখেছে সে গোটা কৃষক সমাজের বিপর্যয়কে।

কিন্তু তবুও সকলকে ধরে রাখতে পারেনি সে। প্রথম হারিয়েছে নিরঞ্জনকে। সে দেশান্তরী হয়েছে, দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় ঝালা-পালা হয়ে। পরে পুত্র মাখনকে অতর্কিত মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর প্রাণের প্রিয় আমিনপুর, তারপর ভ্রাতৃবধু বিনোদিনী। কিন্তু তবুও অবিচলিতভাবে ভিখারী জীবনের হাত ধরে নিদারুণ দুঃসময়ের আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে সে। বৃদ্ধ প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে টুকরো খানেক খাবার অন্বেষণ করেছে ডাস্টবিনের মলয়া ঘেঁটে। পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে পশুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য :২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) কিন্তু তবু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগেনি। দুর্দান্ত জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়নি। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে গভীর মমতায়। স্ত্রীর প্রতি তার সেই মমতা অজস্রধারে ঝড়ে পড়েছে। গভীর প্রেমে, ‘কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর।’ ফুটপাতের ওপর তৈরি করে ফেলে বড় প্রেমের এক বিরল অথচ সকরুণ মুহূর্ত।

এই স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা কুঞ্জ চরিত্রের সবচেয়ে বড় সম্বল। ঝড়-ঝঞ্ঝা দৈব-দুর্বিপাকেও সে বিনষ্ট হতে দেয়নি এগুলিকে। রক্তাক্ত হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; লাঞ্ছনা, অবমাননা আর নিপীড়নে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে যায়নি। আজন্ম কালের বাস্তুভিটা আমিনপুরের স্মৃতি একটুও মলিন হয়ে যায়নি। স্মৃতির টানে তাই সে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করে, ‘হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না।’ (৩/১) আমিনপুর-প্রীতিই তার প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

সর্বশেষে বলা যায় কুঞ্জ চরম আশাবাদী। বড় বড় দুর্ঘটনা তাকে নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করেনি। সব হারিয়েছে বটে তবে হা হুতাশের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করেনি। বরং সর্বহারা হয়েও অন্তরের অন্তর্স্থলে জ্বালিয়ে রেখেছে আশার অনির্বাণ দীপশিখা। তাই, রাধিকা যখন বলে, ‘গাঁয়ে ফিরে যাবে, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?............সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—’(৩/১) কুঞ্জ তখন হতাশ রাধিকার সামনে হাজির করেছে একবুক আশা, ‘আশা হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে।’ কুঞ্জর এই আশা হতাশের প্রতি স্তোকবাক্য নয়। এক বাস্তব বোধসম্পন্ন দূরদর্শী মানুষের আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে কুঞ্জ গ্রামে ফেরে এবং ফিরে পায় তার পুরো সংসার। তাই কুঞ্জ সম্পর্কে বলা যায়, সঠিক অর্থে যদিও কুঞ্জ ট্রাজিক চরিত্র নয়,

আর নবান্ন নাটকও ডোমেস্টিক নাটক নয়, তথাপি সে রাউণ্ড চরিত্রের অধিকারী মানতেই হবে।

'নবান্ন' নাটকে নিরঞ্জন চরিত্রটিও একটু গুরুত্ব দাবী করে। যদিও চরিত্রটির গতিপ্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়। সংসারের অভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দুঃখ ভোগের দার্ঢ্য তার ছিলনা। দুঃখের আতিশয্যকে সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গিয়ে উপার্জনের স্বতন্ত্র রাস্তা ধরতে চেয়েছে এবং ধরেছে। কিন্তু পুরো গ্রামটার সঙ্গে তাদের সংসার তরণীটি তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন স্বতন্ত্র জায়গায় ঝঞ্ঝার থেকে পিঠ ফিরিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে। তথাপি দুটি কারণে চরিত্রটিকে অল্পাধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সে গ্রামের চোরাচালানকারী হারু দত্ত এবং দুশ্চরিত্র কালোবাজারী কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেওয়ায় দুঃসাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ফিরে গিয়ে ভাঙা সংসারকে গড়ে তুলেছে, যে সংসারের আওতায় কুঞ্জ রাধিকা ফিরে গিয়ে পুনরায় পল্লী জীবনের সুন্দর সুনিবিড় ছায়ায় আত্মস্থ এবং আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান সমাদ্দার ফিরে পেয়েছে তার বিপন্ন চৈতন্য। সে স্বস্ত অনুভব করেছে মারি মন্বন্তরের বিরুদ্ধে জোড় প্রতিরোধের সুদৃঢ় আশ্বাসে।

দয়াল চরিত্রটি পূর্বাপর পরম্পর্য সম্পন্ন ক্রমবিকাশমান চরিত্র নয়। তাৎক্ষনিক চমকসৃষ্টির এক বিশেষ প্রক্রিয়া প্রদর্শনের ইচ্ছার দ্বারা চালিত সে। গূঢ় কোন ব্যঞ্জনা কিংবা দুঃখ আর দুঃখ জয়ের কোনো বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা সে পরিচালিত হয়নি। নাটকের ভূমিকালিপিতে তার যে পরিচয় জানা যায় তাতে সে প্রতিবেশী মাত্র। অভাবের সংসার ; জমির উপর নির্ভরশীল জীবন। সে আর তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান 'রাঙা'কে নিয়ে তার সংসার। বন্যা এসে তার স্ত্রী ও পুত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভেঙে দেয় তার সাধের সংসার। কিন্তু তারপর গোটা গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের জীবনে আকাল নেমে আসে এবং আকালের দুর্দান্ত আক্রমণে ঝনঝাহত পতঙ্গের ন্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন সে কোথায় ছিল তা জানা যায়নি। অথচ তাকে পুনরায় দেখা গেল এই নাটকের প্রত্যাবর্তন পর্বে। তখন সে অনেকটা উদ্দীপ্ত। গ্রাম্য মানুষদের দলপতির ভূমিকায় তখন সে দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে এই উদ্দীপ্তির অপর্যাপ্ত শক্তি সে সঞ্চয় করল এবং গ্রাম্য জনতার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সে কেমন ভাবে অর্জন করল তার তেমন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ নাটকে নেই। নাট্যকার শেষপর্বে তাকে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা, শস্য উঠিয়ে ধর্মগোলায় তোলার পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করা এবং নবান্ন উৎসবের রূপরেখা অঙ্কনের অগ্রবর্তী ব্যাক্তি হিসাবে প্রতিরোধের তেজঃদৃপ্ত বক্তব্য প্রকাশের পুরোধা হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার হঠাৎ তাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি। চরিত্রটা অতর্কিতভাবে অনেকখানি গুরুত্ব পাওয়ায় খাপছাড়া হয়ে গিয়েছে। বন্যার পর সে কোথায় কিভাবে ছিল জানা যায় না। সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছাড়ার পূর্বে তার ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে শেষ পর্যায়ে এসে তার ওইরকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছবি খুব খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে 'মোমেন্টাম'সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরিত্রটা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে বলা যেতে পারে।

চোরাচালানকারী হারু দত্ত কালোবাজারী দুশ্চরিত্র কালীধন ধাড়া এই নাটকের দুটি খল চরিত্র। খল অর্থে দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে ভিলেন। এই নাটকে সমাদ্দার পরিবার এবং আমিনপুরের কৃষকেরা প্রগ্রেসিভ ফোর্স পজিটিভ শক্তি আর হারু দত্ত কালীধন ধাড়া নেগেটিভ ফোর্স দুষ্টচক্র। এরা মজুতদার,দালাল,

মানুষ, ও খাদ্যের বেআইনি ব্যবসাদার। ধূর্ত, মুনাফাখোর, পরশ্রমজীবী, সমাজের নোংরা লোক। নিজেদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কাজ নেই। এরা দুজনেই আকাল কবলিত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ কারবারে লিপ্ত থাকে। কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলবার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করে চলে।

হারু দত্ত গ্রাম থেকে ধান এবং চাল কম দামে কিনে নিয়ে কালীধনের গুদামে তুলে দিয়ে আসে। কালীধন তা মজুত করে সময় মত বেশি দামে লোক বুঝে বিক্রি করে। সেই সঙ্গে হারু দত্ত গরিব গৃহস্থ ঘরের যুবতী মেয়েও ক্রয় করে কম দামে ও বেশি পয়সায় সরবরাহ করে কালীধনের সেবাশ্রম নামক নারী ব্যবসার এক অবৈধ কেন্দ্রে। তাছাড়া হারু দত্ত অভাবের সুযোগে জোতজমিও কিনে নেয় কম পয়সার বিনিময়ে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবারকে পথে বসায় এই হারু দত্ত। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সংগ্রাম করতে করতে এই পরিবারটা যখন মুমূর্ষু, তখন সেখানে নেকড়ের থাবা বসায় সে। কুঞ্জর একটি সংলাপে এই চরিত্রটার কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়, 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে।' প্রয়োজনে এই হারু দত্ত, গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে ভগবানের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়, 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দেখাবে বলে, তা জানি।' কিন্তু সে সবে যখন কাজ হয় না, তখন সে স্বরূপ ধারণ করে,'উঁ, সোজা শিরদাঁড়াটা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয়; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্দ্ধা!' নিজের লোকজনদের ডেকে হুকুম দেয়, ' দে তো রে আচ্ছা করেঘা দু-চার —' (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) আবার মেয়ে কেনবার সময়ে কৌশলপূর্ণ চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে মেয়ের বাপকে। মেয়ে সংগ্রহের জন্য সে খুকির মায়ের মত মেয়ে দালাল ছড়িয়ে দেয়। তারা ফাঁকফোঁকর বুঝে তুলে আনে মেয়ের বাপকে। হারু দত্ত মারপ্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলে তাকে । 'কিছু না, কিছু না। আমি দেখবো তোমার আপদে , তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন! —কী বল চন্দর?' প্রথম শিকারকে সে চারিদিক থেকে ঘিরে ফ্যালে, তারপর তার ঘাড়ে কামড় বসায়, 'দু- চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো!' তারপর হর হর করে বিষ ঢেলে দেয়, 'তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। ...... তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। এবম্বিধ প্রকারে কাজট হাসিল করে নেয়, 'ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো ।' মেয়ে বিক্রির কোবালায় টিপসইটা দিইয়ে নেয় আটঘাট বাধবার জন্যে, 'মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোন মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নেই— কথা এই বললে ফুরিয়ে গেল ! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে।..... চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁ।'

(২য় অঙ্ক,৪র্থ দৃশ্য)

হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত এবং জালিয়াত। নাট্যকার অতিযত্নে চরিত্রটা গড়ে তুলেছেন। নিপুনভাবে তার মুখে সংলাপ বসিয়েছেন এবং অঙ্গাভিনয়ের যথেষ্ঠ সুযোগও রেখেছেন। ফলে চরিত্রটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কিন্তু সেই তুলনায় কালীধন ধাড়া অতটা ফুটে উঠতে পারেনি। সাধারণত মজুতদাররা একটু মোটাবুদ্ধির হয় , বুদ্ধির চেয়ে টাকার জোরটাই তাদের বেশি। কালীধন প্রচুর টাকার মালিক। বিরাট কারবার তার। প্রচুর

চাল গুদামজাত করে রেখেছে সে। বলা বাহুল্য দেশের আপৎকালীন অবস্থায় 'ভারতরক্ষা আইন' বলে মন্বন্তরের বাজারে এই মজুতদারী একেবারে বে-আইনি, দণ্ডনীয় অপরাধের সামিল। এহেন গুদাম সংরক্ষণের এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, কিন্তু কালীধন সেই সতর্কতা অবলম্বন করেনি। দ্বিতীয়ত নারী ব্যবসার কেন্দ্র সেবাশ্রমটির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কালীধন সে প্রয়োজন বোধ করেনি। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু দুরদর্শিতার ছিল একান্ত অভাব। তার ধারণা ছিল তার নৌকার পালে যে সুসময়ের হাওয়া লেগে নৌকাটি তরতর করে সমৃদ্ধির উজানে ছুটে চলেছে এর কখনো কোনদিন ব্যত্যয় ঘটবে না এতোখানি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে নিরঞ্জন বিনোদিণীর জালে জড়িয়ে পড়ল এবং একেবারে ভরা ডুবি হয়ে গেল। তৃতীয়ত, হারু দত্তের সঙ্গে বুদ্ধির কসরতে সে এঁটে উঠতে পারে নি। হারু দত্তের দশ ঘাটে জল খাওয়া ঘোড়েল লোক। বুদ্ধি তার পাকা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী। তার সঙ্গে বুদ্ধির কসরৎ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে কালীধন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য হারু দত্ত অনেক কথা খরচ করে, কিন্তু সেই কথাগুলোকে সে কথার কথা বলে ধরে নেয়। কালীধন কিন্তু চালাকচতুর নয়, কথার চাতুর্য তার তেমন নেই, কথাও তেমন বুদ্ধিদৃপ্ত নয়। নাট্যকার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে এই দুটি চরিত্র গড়ে তুলেছেন।

নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য আর একটি চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজে ধরা পড়ে। চরিত্রটা খুব ছোট, স্বল্প পরিসরে আবর্তিত হয়ে টাইপ চরিত্রের 'ফরমুলাকে পালন করবার চেষ্টা করেছে। চরিত্রটার নাম রাজীব। রাজীব পূর্ববঙ্গবাসী। নাটকের প্রেক্ষাপট ও চরিত্র পরিকল্পনার আদর্শ ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে সে। কয়েকটি তুলির টানে এই ছোট চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রটা প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করে হাই তুলে তিনতুড়ি বাজিয়ে, 'রাধে গোবিন্দ বল মন।' অথচ এই গোবিন্দের জীবটি মানুষের ক্ষুধায় তীব্র ব্যঙ্গ করে, 'চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব। দুর্ভিক্ষের বাজারে মানুষ যে মানুষ নেই, অন্নের হাহাকারে পাগল হয়ে গেছে সবাই, কালীধনের গদিতে সরকারের চাকরি করতে করতে তা তার জানা হয়ে গেছে। কালীধন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ছাড়া ক্ষুধার্ত জনগণ মানুষ কিনা সে সম্পর্কে তীব্র সংশয় প্রকাশ করে সে, 'আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।' তাই ক্ষুধার চাল না পেয়ে তারা যখন ক্ষিপ্ত স্বরে কথা হলে তখন সে কালীধনের হয়ে প্রবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে, 'দে দ্যাখ —আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেদে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি।' (২/১) ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার শেষ সিদ্ধান্ত, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব, মরার আইস্যা পরছে শহরে— কিংবা বিনোদিনীর সঙ্গে সেবাশ্রমে নিরঞ্জনকে কথা বলতে দেখে সবিস্ময়ে বলে , 'রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইকা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ.....চুপ কইরা আছস অহন, কথা সে কস্ না বড়!.....ভাবস বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না! (১/৫) তার ধারণা এবং বিশ্বাস প্রেম ভালবাসা কালীধনের ব্যক্তিগত এক্তিয়ার , এসবে আর কারো অধিকার নেই। তাই সে নিরঞ্জনকে শাসায়, 'সিংহর মুখে খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিছিস তাইতে! বাবু তোরে আজ কী করে দেহিসনে.... বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!' আবার বিনোদিনী যখন ঘরের বাইরে যেতে চায় তখন তাকে গিয়ে বাধা দেয়, 'আরে এইডা কী কর ! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দরমহলে । বাইরে যাবা

ক্যান। যাও ভীতরে যাও।— কী আশ্চর্য!' (২/৫)

রাজীব বৃদ্ধ কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি সে। অন্ত্যন্ত করিৎকর্মা। কর্তার বিক্রম প্রকাশ করতে পঞ্চমুখ সে । নিজের প্রভুত্ব খাটাতে সে খুব তৎপর। কালীধনের সেবাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড তার জানা। এখানে যে সমস্ত স্ত্রী লোকেরা তাদের প্রতি অন্য কারো দৃষ্টি পড়াটা সে যেমন বরদাস্ত করতে পারে না, ঠিক সেই রকম এখান থেকে কোনো স্ত্রীলোক বেরিয়ে যেতে চাইলে সে সতর্ক প্রহরীর মতো বাধা দেয়। চরিত্রটির মধ্যে খুব গভীরভাব এবং ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়না। হালকা —উপরিস্তরে ভাসন্ত এই চরিত্রটা নাট্যকার অতি যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছেন। কথাবার্তা, হালচাল, আদবকায়দার মধ্যেবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চরিত্রটিকে খুব উপভোগ করে তুলেছেন বলতে হবে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলো ছাড়াও 'নবান্ন' নাটকে স্ত্রী চরিত্র আছে কয়েকটি। যেমন, পঞ্চাননী, রাধিকা এবং বিনোদিনী ইত্যাদি।

পঞ্চাননী প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী। আমিনপুরের বৃদ্ধ মহিলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমিনপুর তথা মেদিনীপুরের একটা বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। গান্ধী বুড়ি মাতাঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এই ঐতিহ্যের পথ ধরে পঞ্চাননী চরিত্রটি নবান্ন নাটকে এসেছে। প্রধান সমাদ্দারের উপযুক্ত স্ত্রী সে। আগষ্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার মানসিকতা ঘিরে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে ভয়ে ভীতু আমিনপুরের মেয়েরা লজ্জা শরম খুইয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। এর চাইতে অপমানের কিছু আছে? পঞ্চাননীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়— বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়ে মানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? (১/১)......সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়ে মানুষের ইজ্জৎ! !' (১/১০)— উত্তরে কুঞ্জর কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক বক্তব্য না শুনতে পেয়ে পঞ্চাননী স্বয়ং একটা জনতাকে নেতৃত্ব দেয়। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের মার খেয়ে পলায়নপর জনতাকে মারমুখি করে তুলে বিশেষ সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জীবনী শক্তি তখন তার খুব কম অংশই অবশিষ্ট ছিল, তাই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নাট্যকারের এটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি বলতে হবে।

বিনোদিণী সুসংগত, সংযত এক গ্রাম্য বধূর সু-অঙ্কিত চরিত্র। সমাদ্দার পরিবারের কনিষ্ঠ বধূ লজ্জাশীলা ধী-শক্তি সম্পন্না। স্বামী নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও সে এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখবেদানার সমান অংশীদার হয়ে এই পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। তাঁর একটাই বেদনা—স্বামী নিরঞ্জন সংসারের সংকটে সকলেই যখন ঝালাপালা তখন বিনোদিনীর পাশে থেকে,দুঃখ বরণের সহমর্মী হয়ে, মানসিক স্বস্তি ও আশ্বাসের স্থল হওয়ার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে দেশান্তরে চলে গেছে। শত মান অভিমান অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। তাঁর নারীসত্তার এ অবমাননা বড় বেদনাদায়ক। অতঃপর পরিবারের সকলের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে অতর্কিতভাবে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক টাউট তাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এনে তুলে দেয় কালীধনের সেবাশ্রমে। এখানে ঘটনা চক্রে সে মিলিত হয় স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন রাখহরি নামে সেখানে কালীধনের কর্মচারী। নিরঞ্জনকে বিনোদিনী সেবাশ্রমের সমস্ত বিবরণ দেয় এবং কৌশলে কালীধন ধাড়া ও তার সরকার রাজীব সমস্ত বামাল

সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর বিনোদিনী নিরঞ্জনকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভেঙে পড়া ঘর ও অগোছালো সংসারকে সে পুনরায় গড়ে তোলে। বিনোদিনী একটি সুঅঙ্কিত গ্রাম্যবধূর চরিত্র।

রাধিকা নবান্ন নাটকের সবচেয়ে বড় স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী এবং সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। এই চরিত্রটির তিনটি অংশ। পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ হিসাবে সে খুব দায়িত্বশীলা; সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলবার মনোবাসনা তার অকৃত্রিম। অভাবের সংসারে ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদে যেমন জড়িয়ে পড়ে, তেমনই দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহে ভরপুর। দ্বিতীয় অংশ শহরের ফুটপাতবাসিনী। এই অংশে ক্ষুধার সঙ্গে তীব্র সংগ্রামরত সে । কিন্তু ক্ষুধার লেলিহান শিখা তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বামী ভক্তি ও স্বামীপ্রেমকে খাক করে দিতে পারেনি। বরং তা আরো গাঢ় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কুঞ্জর হাতে কুকুরে কামড়াবার দৃশ্যটি এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কুকুরে কামড়াবার অব্যবহিত পরে রাধিকার অন্তরের অভিব্যক্তি ধাপে ধাপে গভীর থেকে গভীরতম স্তরে পৌঁছেছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া 'একেবারে কামড়ে খেলে গো'র অনিবার্য সাধারণ গ্রাম্য নারীসুলভ প্রকাশ—'ভারি পাজি কুকুর তো। .....দূর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো।' বক্তব্য বিষয় অনেকটাই অমার্জিত Crude । এটি যখন অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে, তখন 'ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো।' ঘর বার যখন একাকার ,তখন তার এ উপলব্ধি অন্তরে যে অসহায়তা তারই প্রকাশ উপরোক্ত অংশে। বোধ করি স্বামী কুঞ্জর যন্ত্রনাকাতর মুখ লক্ষ্য করে, তারচৈতন্যের গভীরে যে উপলব্ধি তা থেকেই বেরিয়ে আসে, 'খুব যন্তনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?— এ যেন নতুন করে স্বামী প্রেমকে ফিরে পাওয়া, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার। তারপর ফিরে এসেছে স্বামীর হাত ধরে নিজেদের গ্রামে। তৃতীয় অংশ গ্রামপ্রীতি। গ্রামে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার অন্তরে একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। তাই কুঞ্জ যখন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করে, রাধিকা তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করে। সেই মুহূর্তে তার অন্তরে শাশ্বত মাতৃত্বের জাগরণ ঘটে। মৃত পুত্র মাখনের জন্য তার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে সে সমস্ত কিছু ভুলে নতুন করে গড়বার আনন্দে আবার মেতে ওঠে। এই অংশের রাধিকাকে আমরা আবার প্রথম অংশের রূপে দেখে মুগ্ধ হই। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি অনবদ্য নারী চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রটি গভীর নিষ্ঠা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে গড়ে তুলেছেন।

৪৮.১২ 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ ও গান

নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপের ওপরেই নাটকের নাটকীয়তা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা, নাটকীয় বৃত্ত গঠন, চরিত্রের বিকাশ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নির্ভর করে। সাহিত্যে অন্যান্য প্রকরণগুলিতে রচয়িতার এক নিজস্ব কলম থাকে, যে কলমে তিনি কিছু বর্ণনা, কিছু বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কাহিনী, চরিত্র, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, স্থান ও কালের অনেকখানি পরিচয় দিয়ে থাকেন। নাটকে কিন্তু নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। নাট্যকার এ সমস্ত কিছুই সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। নিজে করতে গেলেও নিজেকে প্রথম চরিত্র করে তুলতে হবে,

তারপর অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুক্তিগ্রাহ্য পথে সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এ কাজগুলি করে থাকেন।

সুতরাং নাটকের ,সংলাপ যেমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই এর রচনা পদ্ধতির প্রতি রচয়িতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়? সচেতন মনের সযত্ন প্রয়াসেও অতিরিক্ত সাবধানতা গ্রহন করতে হয়। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরগ্রাম্যভিত্তিক সংলাপ রচনা করতে না পারলে নাটক প্রার্থিত ফলদানে সক্ষম হয়না। মনের বিভিন্ন-ভাব- অনুভাব বিভাব, সঞ্চারী ভাবকে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্বর সহযোগে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলেই নাটক থেকে উপচিত হবে যথেষ্ঠ উপভোগ্য নাট্যরস। এই সংলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে বাচিত অভিনয়ের বহুবিধ উপকরণ, আবার এই সংলাপের মধ্যেই অনুল্লেখিতভাবে জড়িত থাকে অঙ্গাভিনয়ের নানা নির্দেশ। যেমন, ‘চলে যাও’ বললে একরকমের অঙ্গাভিনয় হবে, আবার যাও, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও’ বললে অঙ্গাভিনয়ের ধরনটা যাবে বদলে,আবার, ‘যাও, যাও চলে যাও’ বললে তার অঙ্গাভিনয়টা হবে অন্যরকম।

এই যে নাটকে দ্বিবিধ অভিনয় তা সংলাপের ওপরেই নির্ভরশীল। তাই যে নাট্যকার যত বেশি ভাল সংলাপ রচনা করতে পারেন, সেই নাট্যকারের নাটক রসিক মহলে তত বেশি সমাদৃত হবে। সেই নাট্যকার কালের দেওয়ালে হাত রাখতে পারবেন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে , হালকা সংলাপের নাটকে সুদক্ষ অভিনেতাও, সুনাম অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু ভাল সংলাপ সংযুক্ত নাটকে তৃতীয় স্তরের অভিনেতাও অতি সহজে দারুন অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সংলাপই নাটকের প্রাণ। তাকে আশ্রয় করেই নাটকের চরিত্রেরা চলাফেরা করে, তারা পরিস্ফুট হয়, বিকশিত হয়। তাই সংলাপ হওয়া উচিত স্বাভাবিক কথা ভাবানুগ, চরিত্রানুগ ও সংক্ষিপ্ত। এই ধরনের সংলাপ রচনার সূত্রপাত করেন মধুসূদন। তিনি একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন, I shall endeavour to creat characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry. — অর্থাৎ চরিত্র স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, কাব্যাংশ আওড়াবে না। তার পরিচয় পাওয়া গেল মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে— ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ’ আর ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘কৃষ্মকুমারী’ নাটকে। কৃষ্ন কুমারিতে এসেছে কথ্যরীতি। সংলাপ উচ্চারণের কাল হয়েছে দ্রুত, দ্বন্দ্বমথিত তীব্রতায় সংলাপ চরিত্রকে ব্যক্ত করেছে। সংলাপগুলির ভাষায় চরিত্রগুলির ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের প্রহসন দুটির সংলাপ ত্রুটিমুক্ত, প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত ও অনুভূতিগত। সংলাপ, সংস্কৃত নাটকের সংলাপরীতি অনুযায়ী বিবরণধর্মী না হয়ে বক্তব্যের বাহন হয়েছে। বগতোক্তি প্রায় বর্জিত, যা আছে তা সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ন। সর্বোপরি সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ। ‘একেই কি বলে সভ্যাতা’র থেকে একটি উদাহরণ তুললে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে। নায়ক নবকুমারের ইয়ার কালী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, ‘কি পরিচয় দেব বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিএরের —মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ— সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয় —শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—’

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রতীক আর রুপকধর্মী। কাব্যরসাশ্রিত প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনার

যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অসম্ভব রকমের নিজস্বতার স্বাতন্ত্র্যে তিনি উদ্ভাসিত। তাঁর সংলাপ অনেক সময় তরঙ্গায়িত বলে মনে হতে পারে। সহজ সরল শব্দগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজান যে তার থেকে কাব্য ঝরে পড়ে। লোক প্রচলিত বাজার চলতি শব্দের ব্যবহার না থাকবার দরুন একটা মার্জিতরূপ গড়ে ওঠে। কবির মনোলোকের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয় শব্দতরঙ্গ, সংলাপের মধ্যে আনে এক বোধসম্পন্ন অনুভববেদ্য আবেশ। শ্রীশম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন, জীবন প্রতিম বলে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুন্ন রাখতে পারতেন।' প্রসঙ্গক্রমে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অথবা 'কালের যাত্রা' প্রভৃতির সংলাপের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের প্রসঙ্গে একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি নাটকের সংলাপ লিখতেন কবির কলমে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের বিবর্তন ঘটে গেছে। সংলাপের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে গেছে আমূল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ থেকে এই সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দর্শক এবং চরিত্রের তফাৎটা ভেঙে ফেলে পারস্পররিক সাযুজ্য সন্ধানে নতুন রীতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়েছে বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায়। আমরা পার হয়ে এসেছি—

'গর্ব, মান, বীর-অহঙ্কার—
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।' (গিরিশচন্দ্র)

কিংবা, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ আগুনের শিখা লক লক করে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঐ আর্তনাদ, ঐ হাহাকার—হাঃ হাঃ হাঃ— (অপরেশচন্দ্র)

কিংবা, '—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারদিকে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে। কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠবে। উঠুক! একদিন আসবে, সেদিন ঐ সূর্য্য আর উঠবে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হবে যাবে। তার পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের ওপর এসে পড়বে। তারপর তাও পড়বে না। কৃষ্ম সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই? — কে?' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

অথবা, 'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন ভাবে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছা করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত। (রবীন্দ্রনাথ)

এ সমস্ত সংলাপ অতিক্রম করে চল্লিশের দশক লিখছে, 'হেঃ, এ রক্তের আবার দাম! এ রক্তের জন্যে আবার মায়া! জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গালে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা — ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ, তুই আমারে ছেড়ে দে।— আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি —আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতি ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ।—

এই সংলাপ যেন প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে উঠে এসে রূপ নিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে। অদ্ভুত রকমের জীবন্ত, বাস্তব, স্বাভাবিক। বাস্তবধর্মী জীবনের উষ্ণতায় ভরা অথচ মেদবর্জিত, বহুবর্ণ অননুরঞ্জিত পেলবতাহীন, অপ্রলম্বিত মৃত্তিকাশ্রয়ী মৃত্তিকাগন্ধী সংলাপ। সর্বনাশা সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রতিকারহীন প্রতিরোধস্পর্ধী আত্মার উত্তপ্ত গ্লানির কেন্দ্রস্থল থেকে উঠে এসেছে,— 'ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি)—'

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!! (কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান)

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যাঃ!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

চল্লিশের দশকে 'নবান্ন' ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনের ঊষর ক্ষেত্রের ওপর দণ্ডায়মান কতগুলো মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহায় মুমুক্ষু আত্মার মর্মবাণী, 'আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোস নি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।'

এ সংলাপ যেন নাট্যকারের নয়, এ সংলাপ চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্র নয়, সময়ের ঝঞ্ঝাবর্ত্তে ব্যতিব্যস্ত কৃষিভূমিতে দণ্ডায়মান অকালগ্রস্ত, অথচ ভাগ্যবাদী চরিত্রও নয়, বরং বাস্তববোধের দ্বার বিদীর্ণ কতকগুলি জীবন্ত মানুষ। 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' সংলাপ তাই উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তঃস্থল ঠেকে 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে। এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' অত্যাচারী লুণ্ঠনস্পৃহ দানবের বিরুদ্ধে চাষাড়ে রক্ত টগবগে হুংকার ছোড়ে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

সংলাপের শব্দগুলো লক্ষ্য করবার মতো এসব শব্দের জন্মভূমি নাট্যকারের মনোজগৎ নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্নার মধ্যে, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তরের মধ্যে এর অস্তিত্ব। তাদের আনন্দ-উৎসব, পালপার্বণ, সুখদুঃখ, যন্ত্রণা হাহাকার, রাগদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ এবং ক্রোধোন্মত্ত অন্তরের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে রচনায় এসেছে শব্দের মণিমাণিক্য।

গ্রামের চাষী মজুরের ভাষা ও শহর কোলকাতার আটপৌরে ভাষার অস্তিত্বও দেখা যাবে 'নবান্ন' নাটকে। আবার পূর্ববাংলার উপভাষা এই নাটকে এসে গেছে রাজীবের মুখে। এ ছাড়া আরবী, ফার্সি শব্দ এসে গেছে।

মোটের ওপর এই চার রকমের ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ।

'নবান্ন' নাটকের গঠনগত একটা বিশেষত্ব— প্রায় প্রতিটা দৃশ্যে একটা করে চরম মুহূর্ত গড়ে তোলা হয়েছে দৃশ্যান্তে। সেই চরমমুহূর্ত গড়ে উঠেছে সংলাপের অদ্ভুত ঠাস বুননে—

(উন্মত্ত অবস্থায় নেপথ্য থেকে দয়াল 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দেয়)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ........কুঞ্জ! ....কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ,কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে আটপৌরে ঘর-কন্নার ভাষাকে দিয়ে কি অদ্ভুত ভবে ক্লাইমেক্স গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। বন্যায় দয়ালের ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র গোটা সংসারটা ভেসে গেছে। সেই যন্ত্রণার হাহাকার বেরিয়ে এসেছে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কুঞ্জ কুঞ্জ ডাকের মধ্যে। দর্শক অতর্কিতে ওই আর্তনাদে চমকে চমকে ওঠে। নাট্যকার প্রধান শব্দটা ব্যবহার করলেন না, কেন না, কুঞ্জ শব্দটার ভেতর অভিনেতা, আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরের ঢেউটা খেলাতে পারবেন, যে ঢেউ দর্শক মনে উত্তাপ তরঙ্গ তুলবে। আর একটি শব্দ 'সমুদ্দুর'। সমুদ্র বললে স্বরক্ষেপের কালসীমা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, 'সমুদ্দুর তারও চেয়ে অনেক বেশি হয়। অভিনেতা কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলবার সুযোগটা পেয়ে যান।

হারু দত্তের সরীসৃপ মন লালাসিক্ত রসনায় উচ্চারণ করে অদ্ভুত সংলাপ, 'হেঃ, হেঃ ছেলেমানুষ কিনা!' প্রস্থানরতা বিনোদিনীর দেহের প্রতি লোলুপতা প্রকাশের পক্ষে ওইটুকু সংলাপই যথেষ্ট। কিংবা কুঞ্জকে যখন হারু দত্তের লোকজন লাঠিপেটা করছে প্রধানের সংলাপ তখন তৈরি করছে অদ্ভুত 'সিকোয়েন্স', 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' —সংলাপের ওপর অভিনয়, দর্শক মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যাওয়ার মতো। আবার তিনটি শব্দের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে প্রেক্ষাগৃহ উত্তাল আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাখনের মৃত্যুদৃশ্যে কুঞ্জের আর্তনাদ, 'য়্যাঁঃ মাখন, মাখন—' লক্ষ্য করবার মতো শব্দগুলো মোটেই আবেগময় নয়। আবেগ উচ্ছ্বাস বর্জিত। এই ধরনের সংলাপ রচনা করে নাট্যকার তাঁর নবান্ন নাটকের বিশেষত্ব মণ্ডিত করেছেন।

রাজীব পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় অদ্ভুত অমানবিক ধরনের সংলাপ উচ্চারণ করে, যাতে তার প্রতি দর্শকের ঘৃণা এবং ক্রোধ যুগপৎ বেরিয়ে আসে। 'দে দ্যাখ— আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দে চে রাখহরি—' বা প্রধানের উন্মত্ততা প্রকাশের জন্যে নাট্য সংলাপ অদ্ভুত শব্দ সহযোগে গড়ে তোলেন, 'ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—' আবার আবেগময় রূপকধর্মী সংলাপ রচনায় নাট্যকার সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করেন নিপুণ হাতে,—'তাই ভালো। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।'

শহুরে ভদ্র সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নির্মলবাবু। স্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের অর্থগৃধ্নুতা এবং দুর্ভিক্ষের বাজারে অন্ধকার পথে কামানো অর্থে ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রকাশের বিপক্ষে বিরুদ্ধ মানসিকতা পোষণ করে অর্থহীন মানুষদের পক্ষে সওয়াল করেন শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত সহজ সরল সংলাপে, সে পয়সা যাদের আছে তার বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার সেটা নেই কি-না?' এই দৃশ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রকাশের উপযুক্ত সংলাপ। নাট্যকার এই শব্দ দুটির অভিনয় করিয়েছেন 'অফ ভয়েসে'। নেপথ্য থেকে মাইক্রোফোনে।

দেশী শব্দের সঙ্গে আরবি ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্যকার নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্য এনে সংলাপকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন যেমন, তেমনি ব্যক্তি পরিচয়ের বাহন হয়ে উঠেছে এ সংলাপ। '............আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর ! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণনাটকের আসল সংলাপ। গণনাটকে গণচেতনা বৃদ্ধির একটা সচেষ্ট প্রয়াস থাকে। সেই চেষ্টাকে সফল করে তোলবার জন্য নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। নাটককে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সেই সচেতনতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে গেলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে গেলে সংলাপকে সর্বজনবোধ্য করে তুলতে গেলে সহজ সরল শব্দ, অতি প্রচলিত সাধারণ শব্দ দিয়ে সংলাপের দেহ গঠন করতে হয়। সেদিক থেকে 'নবান্ন' নাটক যথেষ্ট সফল বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের গান :

শিল্পকলা হিসেবে নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে গানের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোনো দেশেই পূর্ণাঙ্গ নাটক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনি। তার সূচনা কোনো ধর্মীয় বা লোকোৎসবের মধ্য দিয়ে হয়েছে। এই সমস্ত উৎসবকালে গান-নির্ভর আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলার জন্মসূত্র জড়িত। গ্রামীণ সৌরোৎসব থেকে যেমন যাত্রার উদ্ভব ধরা হয়, তেমনি এদেশে প্রাচীন নাটগীত, আধুনিক নাট্যকলার অঙ্কুর বলে মনে করা হয়।

প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন প্রধানত যাত্রা প্রভাবিত ছিল। এই যাত্রাভিনয় ধর্মীয় বা লোকোৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। জনসাধারণের রসপিপাসু মন এর মধ্যেই পরিতৃপ্তি লাভ করত। এই ধরনের রচনায় ধর্মভাব ও সঙ্গীত বাহুল্য ছিল। এ দুটির উপস্থিতিতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যাত্রা লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, মুক্তমঞ্চে, দৃশ্যপট ছাড়াই অভিনীত হত।

উনিশ শতকে বাংলা নাটক ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, বাঙালি জীবনে যাত্রার সংস্কার, সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত মঞ্চমুখী নাট্যকারেরা যাদের প্লে-রাইট বলে চিহ্নিত করা যায় তারা জনচিত্তজয়ের জন্য, তাদের রুচির রীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হতেন। গান এ ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ গণ্য হয়। গানের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, মনোরঞ্জক ভূমিকা আছে। উনিশ শতকের মঞ্চপ্রাণ নাট্যকারেরা অনেকেই গানের বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নাট্যবোধ যেখানে প্রেরণা, জীবনের গানের ব্যবহার নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাটকীয় চরিত্র ঘটনা ও পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ ও অভিনয়কে অর্থবহ করবার জন্য বা ভারাক্রান্ত দর্শকমনকে আনন্দ বিরতি (Dramatic Relief). নীতি উপদেশ প্রভৃতি দেবার জন্যও গানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

কিন্তু 'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকা নিয়ে এমন একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মুখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানী আক্রমণ, ৪২-এর আন্দোলনে উত্তাল এ দেশ, মারী-মন্বন্তর ও জলোচ্ছ্বাস, সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বভাবত নাট্যকারের শিল্পবোধ ও সংযম গানের বাহুল্যকে পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। নাটকটি সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ বৃহত্তর জনসমাজ ও দেশের নানা ঘটনার সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলায় এতই নিবেদিত যে, প্রথম তিনটি অঙ্কের বারটি দৃশ্যে সঙ্গীতের ব্যবহারের সুযোগই ছিলনা। যুদ্ধের জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের জন্য সমাদ্দার পরিবার গ্রাম জীবন থেকে মন্বন্তর কবলিত শহরে আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্কট ও আবর্তে বিব্রত ও হৃতসর্বস্ব হয়ে পরিশেষে ঘরে ফিরেছে। এর পরই একটু স্থিত হবার অবকাশ। বিজন ভট্টাচার্য কতকটা সমাদ্দারদের এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ব্যঞ্জনাময় করবার জন্য এবং বোধকরি কতকটা দর্শক চিত্র রঞ্জনের জন্য, চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই গান সংযোজন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা' দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক ফকিরের গান 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এবং তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক রমণীদের গান 'নিস্‌লো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাসলি।'

সুধী প্রধান লিখেছেন, মুদ্রিত সংস্করণের ১৫ টি দৃশ্যের পরিবর্তে মোট ১৪ দৃশ্যে নাটক অভিনীত হত। ফকিরের গানটি মূল দৃশ্যকে প্রায় সব বাদ দিয়ে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষকদের সভাশেষে এবং কুঞ্জ রাধিকার ঘরে ফেরার আগে গাওয়া হত। নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা'— কোনদিনই গাওয়া হয়নি। এমনকি শেষ দৃশ্যে কৃষক মহিলাদের গান দু'একদিন গাওয়া হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিনয়কালে 'আপনি বাঁচলে' গানটি ছাড়া অন্য দুটি গানের নাট্যোপযোগিতা বস্তুত স্বীকৃত হয়নি।

গণনাট্য আন্দোলন তাঁর অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের উদ্বোধনে দায়বদ্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কত্রয়ে ঘটনার ঘনঘটায় এ বক্তব্যটি তুলে ধরা সম্ভবপর হয়নি। চতুর্থ অঙ্কের শান্ত স্নিগ্ধ

শান্তির পরিবেশে ফকিরের গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত চাষী ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। 'হিন্দু-মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান। ফকির বলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভিন্ন আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।' বহুদর্শী ফকির আকালের, মন্বন্তরের সীমাহীন দুর্দশার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেয়েছে—'বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল' এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাঁতায় খেটে আমন-ফসল ঘরে তোলবার পরামর্শ দিয়েছে।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গাঁতায় খাটার এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে ধর্মগোলায় ফসল তোলার যে সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, তাকেই ফকির তার গানের মধ্য দিয়ে সকলের মনের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। গানটি আপাতদৃষ্টিতে উপদেশাত্মক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গানটির ব্যবহার এখানে নাটকের যে লক্ষ্য—ঐক্য ও সংহতি এবং সমস্ত প্রতিকুলতার বিরুধে প্রতিরোধ রচনা করা তারই ভূমিকা। এদিক থেকে এটি অনেকটা নাট্যোপযোগী।

নিরঞ্জন ও কৃষক রমণীদের গানদুটি সুখী তৃপ্ত গৃহস্থ জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

যুদ্ধ আন্দোলন মারী মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রাম আজ নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু পুরনো দিনগুলো স্মৃতিকে ভাবাতুর করে বইটি! কিন্তু দুঃখের দহন জ্বালার মধ্য দিয়ে তো সুখের আসন প্রতিষ্ঠা এ কথাই তো বিজ্ঞজনেরা বলেন। নিরঞ্জন শুয়ে অবকাশ যাপনের সময় গানের মধ্য দিয়ে স্মৃতিবিজড়িত অতীত স্মরণের মধ্য দিয়ে একটি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছে, দেখা যায়। গানটি কথার সীমা অতিক্রম করে সুরের মধ্য দিয়ে তার স্বজন হারানোর বেদনাভারটিকে পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দেয়। এর পরই কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ যেন—হারিয়ে পাওয়ার সুগভীর আনন্দে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।

কৃষক রমণীদের গান গ্রাম্য মেলার পরিবেশে উপস্থাপিত। মেলারব, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের স্বপ্নরঙিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্কটাবসানে জনমানসের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবার পক্ষে গানটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মূল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেলার আনন্দ-উজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরবার ক্ষেত্রে গানটি যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে।

নাটকের গান তিনটির একটি মাত্র কার্যত অভিনয়কালে গীত হলেও, কোনটিই নাটকের ভাবরসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তো নয়ই বরং নাটকের অভিপ্রায়ের পরিপূরক।

৪৮.১৩ সারাংশ

নাটকে কাহিনীর পর চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য বিশেষত গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য ছিল, সেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্রের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের নাটকে ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আর সামগ্রিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। 'নবান্ন' নাটকে ছোট-বড় চরিত্রের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। চরিত্রসংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাই হয়তো এর জন্য দায়ী। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের সঙ্কট, আগস্ট আন্দোলন,

বন্যা, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বিশাল ক্যানভাসে গ্রাম-শহরের বিপর্যস্ত চেহারা। এ সময় বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের মূল্যবোধে, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলে বিস্তৃতের ক্ষেত্র ও চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরা জনতার ভূমিকা নেয়নি। জনতায় অনেকগুলি মুখের সমাবেশ থাকে, অথচ তাদের চরিত্র এক ও অভিন্ন। এখানে তা ঘটেনি।

গুরুত্ব অনুসারে 'নবান্ন'-এর চরিত্রগুলো হল—প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ, রাধিকা, নিরঞ্জন, বিনোদিনী, পঞ্চাননী ও দয়াল এবং হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া ও রাজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলো নেহাৎই গৌণ— ক্ষণকালের জন্য এসে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু পালন করেছে মাত্র।

প্রধান সমাদ্দার প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তখন থেকেই তাকে দ্বন্দ্বময়, মর্মজ্বালায় জর্জরিত দেখা যায়। সূচনাতেই যখন দেখা যায় কুঞ্জ নিরঞ্জন আর পঞ্চাননী অবস্থার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় জ্ঞাপন করে— প্রথমোক্তরা অসম শক্তি বিন্যাসের কারণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পালিয়ে যেতে বলে, পঞ্চাননী সেখানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এই দুই স্বতন্ত্র মতের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত প্রধান প্রতিরোধের কথা বলে — 'কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।..........আমি প্রাণ দেব। এর পেছনে সক্রিয় ছিল তার পুত্রশোক— শ্রীপতি ভূপতিকে পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণে সে হারিয়েছে। এ যেন হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ । প্রধান ক্ষোভে বলেছে 'জন্তু জানোয়ারের মত বনে জঙ্গালে পালিয়ে' বাঁচতে চায় না।

প্রধান দুটি সন্তান হারাবার পর স্ত্রী পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে-ও পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদিকে প্রকৃতি কেড়ে নিয়েছে তার সমস্ত সম্পদ। প্রলয়ঙ্কর ঝড়, সর্বনাশা বন্যা সঙ্গো নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। প্রধানের স্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছে গেল। তাকেও পথে নামতে হল। বস্তুতপক্ষে নাটকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত তার ওপরই বেশি করে নেমেছে। একের পর কে দুর্ঘটনায় প্রধান তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

এই প্রধানকেই আবার যখন দেখি একদিকে হারু দত্ত, তার বাড়িতে এসে জমি কিনতে চায়, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ হারু গালাগাল দেয়, কুঞ্জ প্রতিবাদ করলে হারুর লাঠিয়ালারা কুঞ্জ ও প্রধানের মাথায় আঘাত করে। অপরদিকে প্রধানের চোখের সামনেই শক্তিহীন মাখনের মৃত্যু হয়, তখন কিন্তু প্রধান কান্নায় ভেঙে না পরে বলে, 'মাখন চলে গেলি'— তখন বোঝা যায় এ বেদনার ভার বড় কঠিন, এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রধান-ই এক সময় ছিল গ্রামের মাথা, নানা প্রতিকূলতায় পথের ভিখারি। তথাপি তার সম্বিত একেবারে হারায়নি। ফটোগ্রাফার তার বাড়ি জানতে চাইলে সে উত্তর দেয়, '......এ-এ চিনতে পারবেন!' কঙ্কালসার দেহের ছবি তুলছে দেখে বলে, 'তা ভালো,......... কঙ্কালের ছবির ব্যবসা! '— এ থেকে তার বোধের মধ্যে যে একটা আলো-আঁধারির পরিবর্তন কাজ করছে তা বোঝা যায়। অপর

এক দৃশ্যে যখন দেখি এই প্রধান উৎসব বাড়িতে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য ভাত চেয়েও তা পাচ্ছে না, তখন ধিক্কার দিয়ে বলে, 'তোমারা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু। ....অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু!' তখন মনে হয় প্রধান সম্ভবত আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে। আবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যথার কথা বলতে গিয়ে অনেক গিয়ে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেছে, যা থেকে তাকে অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকের শেষে গ্রামে ফেরার পর মনে হয়, তার প্রায়ান্ধকার চৈতন্য, পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে আবার ফিরে পায়। বলে, 'ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো।' দয়াল যখন বলে, 'জোর প্রতিরোধ এবার,' প্রধানও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠে 'দয়াল'।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টত এটি উপলব্ধির বিষয় যে, প্রকৃত অর্থে 'নবান্নে' কোনো নায়ক না থাকলেও প্রধান সমাদ্দারই এ নাটকের মুখ্য চরিত্র। মূলত তার সার্বিক জীবন যন্ত্রণা (sufferings)....এ নাটকে প্রধানতম ঘটনা। সে এক সময় গ্রামে সম্পদে প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। ভাইপো, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তাকে মনত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও সমাজ শোষণ তাকে সর্বতোভাবে রিক্ত করেছে। দুই ছেলেকে হারিয়ে, তিন মরাই ধান পুড়িয়ে, ক্ষুধা ও তৃষ্মায় দুর্বল একমাত্র বংশধর মাখনকে হারিয়ে, অভাবের তাড়নায় জমি আংশিক বিক্রি করে, সে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। বাস্তু ছেড়ে শহরে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে—এর চাইতে দুবির্ষহ জীবন যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। সমাজের সংসারের মর্যাদার আসন থেকে এই চরম বিপর্যয় ও পতন, তার মত এমন তীব্র শোক, এ নাটকের কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদিক থেকে প্রধান সমাদ্দার এ নাটকের অবিসংবাদী মুখ্য চরিত্রের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

কুঞ্জ চরিত্রের মধ্যে তারুণ্যের তাজা রক্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সে বোঝে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসকদের শাসনযন্ত্রের বিরুধ্বে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, অকারণ জান দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কুঞ্জই আবার হারু দত্তের চক্রান্তের শিকার প্রধান সমাদ্দারকে জমি বিক্রি করতে বাধা দিয়ে হারুর ক্রোধের কারণ হয়েছে।

কুঞ্জ কোনো দৈব নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস, তারা প্রাণ নিয়েছে, মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেছে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ, বন্যা মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে। তাই সে আর ভাগ্য—ভগবানে নয়, মানুষের নিজের ভেতর যে শক্তি রয়েছে, তার ওপর তার আস্থা সবচেয়ে বেশি।

কুঞ্জ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। স্ত্রী পুত্র, ভাই ও ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের প্রধান সম্পদ জমি,—তার অপ্রতুলতা অভাব দূর করতে পারেনা। সৃষ্টি হয় মতানৈক্য। অনিবার্য হয় ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ। এর ফলে সহধর্মিনীর সঙ্গো কদাচিৎ মতদ্বৈত হলেও পরিবারের অন্যদের জন্য স্নেহ মমতার অন্ত নেই। এই প্রীতিপূর্ণ বন্ধন স্পৃহা কুঞ্জ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কুঞ্জ নিজের সংসারের ঝড়-ঝাপটা সামলায়, শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের জন্যও তার হৃদয়ে দুর্বল স্থান আছে। নিজের পরিবারের জন্য ঘটি বাটি বিক্রি করে দুমুঠো চাল কিনে এনে যখন শোনে দয়ালের কুটোটির ব্যবস্থা নেই, তখন তার শেষ সম্বল থেকে খানিকটা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। সে বুঝতে পারে গ্রামজীবনে একটি অনিবার্য সঙ্কট নেমে আসছে, তাকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর পাঁচজনের যা হবে, তারও তাই ঘটবে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্রামের মাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তারাও শহরের ফুটপাতে নেমে এসেছে। পশুর সঙ্গো খাদ্য কাড়াকাড়ি করে খেতে হলেও ক্ষতবিক্ষত কুঞ্জ হার মানেনি, জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্মা হয়নি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছে, স্ত্রীর প্রতি মমতা, অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছে। গভীর প্রেমে 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। তৈরি হয় প্রেমের বিরল মুহূর্ত। তারা অবশেষে আমিনপুরে ফিরে আসে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং যায়-ও।

নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হলেও দুটি কারণে তার গুরুত্ব মানতে হবে। সে পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গো দুঃখ ভাগ করে নিতে না পারলেও গ্রামের চোরাব্যবসায়ী ও মেয়ে পাচারকারী হারু দত্ত এবং কালোবাজারী ও সেবাশ্রমের নামে নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে স্ত্রী বিনোদিনীকে কালীধনের সেবাশ্রমে ফিরে পেয়ে গ্রামে গিয়ে ভাঙা সংসার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কুঞ্জ রাধিকা পুনরায় সেখানে গিয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান তার বিপন্ন চৈতন্যকে ফিরে পেয়েছে।

নবান্নের দুটি খলচরিত্র হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়া। এরা মানুষেণ্ন জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য নিয়ে কালোবাজারী মজুতদারী করে। নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এরা পারেনা এমন কোনো কাজ নেই। ধান-চালের মত নিজ গাঁয়ের মেয়ে পাচার করতেও এদের দ্বিধা হয়না। এই হারুই প্রধান সমাদ্দারকে টাকার লোভানি দিয়ে সস্তায় জমি কিনে নিতে চায়। বাধা পেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আক্রমণ করতেও তার বাধেনা। পাচারের জন্য মেয়ে কিনতে সে খুকির মা-র মত দালাল ধরে, সেই সঙ্গো নিজেও অক্টোপাসের মত মেয়ের বাপকে ঘিরেধরে কামড় বসায়। হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত ও জালিয়াত। হেন কাজ নেই যা সে পারেনা। নাট্যকার অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রটিকে গড়েছেন বলে সে হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কালীধন সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে চিত্রিত। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, ছিল না দূরদর্শিতা। ভারতরক্ষা আইনের বিধান অমান্য করে প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেনি। ফলে নিরঞ্জন-বিনোদিনীর জালে জড়িয়ে পরে ভরাডুবি ঘটল। এদিক থেকে রাজীব স্বল্প পরিসরে কয়েকটি তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ উপকরণ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব বা 'দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় সব' তীব্র, তীক্ষ্ণ ও মর্মবিদারী।

নবান্নের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে পঞ্চাননী, মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে পরিকল্পিত। প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী সে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা মর্যদাবোধ উল্লেখযোগ্য। আগস্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচারের ভয়ে যখন সাধারণ গ্রামবাসী বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়—'তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? .....সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!!' পুলিশের মার খেয়ে মানুষ যখন পালাচ্ছে, পঞ্চাননী তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন—এগিয়ে যা বলছি, এগিয়ে যা। পঞ্চাননী নিজেও এভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে।

বিনোদিনী সুসংগত, সংযত এক গ্রামবধূর চরিত্র। সে পরিবারের সকলের সঙ্গো দুঃখ যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কালীধনের সেবাশ্রমে নিয়ে যায় এক টাউট। সেখানে আকস্মিকভাবে নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে। নিরঞ্জন বিনোদিনীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, তারা আমিনপুরের বিধ্বস্ত সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

রাধিকা এ নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী, সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। জ্যেষ্ঠ বধূ হিসেবে সকলকে নিয়ে চলবার মানসিকতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীলা গৃহবধূ। অভাবের সংসারে মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তারা ফুটপাথবাসিনী, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে বিপন্ন বোধ করেছে, তখনও তার অন্তরের প্রেম শুকিয়ে যায়নি, বরং এই দুর্দিনে তার স্বামী-প্রেম আরও অনেক গভীর হয়ে উঠেছে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)।

তার চৈতন্যের গভীর থেকে এ প্রেম নিঃসৃত—তা তার কথা থেকে বোঝা যায়—'খুব যন্তন্না হচ্ছে, না! জল এনে দেব, জল? একটু জল খাবে?'—এভাবেই নতুন করে তারা দুজনে দুজনের প্রেমের স্বাদ নতুন করে অনুভব করেছে। পরিশেষে, এই প্রেমই তাঁদের গ্রামে ফিরে নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে। সে মুহূর্তে, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠলেও, তার সামলে নিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু গড়বার আনন্দে মেতে ওঠে। নাটকের দর্শক/পাঠক প্রথম রাধিকাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি স্মরণীয় চরিত্র।

সংলাপ এক অর্থে নাটকের 'প্রাণ-ভোমরা'। সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা, নাটকের বৃত্ত গঠন, চরিত্র বিকাশ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। আবার এই সংলাপের মধ্যেই একাধারে নিহিত থাকে বাচিক অভিনয়ের উপকরণ, অপরদিকে অঙ্গাভিনয়ের অনেক অনুল্লেখিত নির্দেশ। সংলাপে ভাষা তাই নাটকীয় চরিত্রের ভাব, ভাবনা প্রকাশোক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালের ব্যবধানে বক্তব্য পস্থাপনা রীতিরও যুগে যুগে বিবর্তন ঘটেছে। প্রাকরবীন্দ্র, রবীন্দ্র-উত্তর, রবীন্দ্রযুগে নাটকের

ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। চল্লিশের দশকে গণ-নাট্যের নাটকে সংলাপ এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বলা যায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময় সংলাপ হয়ে উঠেছে অনেকটা প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উৎসারিত—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের জীবন্ত ভাষা। যেমন—

প্রধান। চল তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, ... চলো পালাই।

প্রধান। পালাব, পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? (১/১)

এই সংলাপ স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত। এর ভাষা মেদবিহীন, বহুবর্ণরঞ্জিত, মাটিঘেঁষা।

আবার—

পঞ্চাননী। আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে (ক্ষীণকণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব....

পঞ্চাননীর এই বাচিক ও আঙ্গিক সংলাপ চল্লিশের দশকে নবান্ন নাটকের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা সঞ্চার করে দেওয়া অগ্নিগর্ভ বাণী। এ সংলাপ নাট্যকারের সাধারণ সংলাপ নয়—প্রতিবাদী চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট বলা ভুল হবে, বরং বলা ভালো আগস্ট আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবর্তে বিপ্লবী ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা মানুষের। সেই সঙ্গে বলা যায়, দুর্যোগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা মন্বন্তর মারীজনিত দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়ায় ব্যতিব্যস্ত বিপন্ন মানুষ, পুলিশ প্রশাসন, চোরাকারবারীদের অত্যাচারে অসহায় গ্রামবাসী, সেই সঙ্গে যুদ্ধের আক্রমণে দিশেহারা জীবন্ত মানুষগুলির এ হল প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। আবার যখন শুনি 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' (কুঞ্জ ১/৫) অথবা 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' (কুঞ্জ ১/৫)—প্রথমটিতে বক্তার অদৃষ্টবাদ নয়, সুদৃঢ় বাস্তববোধের পরিচয় যেমন ফুটেছে, তেমনি শেষোক্ত সংলাপে যেন উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তস্থল থেকে। এসব সংলাপের শব্দগুলো নাট্যকারের বানানো কথা নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্না, মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে উঠে আসা। শহুরে বিত্তমান মানুষের ভাষা থেকে এ সংলাপ একেবারেই স্বতন্ত্র।

তাই বলা যায় 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণজীবন থেকে পাওয়া যথার্থ অর্থে গণনাট্যের সংলাপ। গণনাটকের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় নাটকের বিষয়বস্তু ও তার বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে

নিয়ে যাওয়া, তার সংলাপের ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'নবান্ন' এদিক থেকে যথেষ্ট সফল।

নাটকে গানের ব্যবহার নানা কারণে হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যাত্রা নাটগীতের সঙ্গে বাংলা নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, নাটকের গঠনের ব্যবহার জন্মসূত্রেই এসে গেছে। তাই গানের একচ্ছত্র আধিপত্য বাংলা নাটকে বাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু যেহেতু প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন যাত্রা প্রভাবিত ছিল, তাই জনজীবনে, সেই সূত্রে সংগীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় আদর্শে বাংলা নাটক রচনার আগ্রহ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক ও বাঙালির যাত্রার সংস্কার সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ফলে গান এক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য হয়েছে। নাটক, বস্তুত জীবনাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের কথা বলা, তার প্রধান দায় হলেও, এই জীবনে বিনোদনের একটি ভূমিকা আছে, আছে, তাই সঙ্গীত—কণ্ঠ ও বাদ্যযুক্ত হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু সঙ্গীত যদি নাট্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে, তবে নাটকের মৌল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের নাটকে নাচ-গানের বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। নাচগান এখানে পণ্য। দর্শক মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য তার প্রধান লক্ষ্য। গ্রিক নাটক বা সেক্সপীয়রের নাটকেও গানের ব্যবহার আছে। গান সেখানে নাট্যবোধ সঞ্চারে যেমন সহায়ক, তেমনি ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বমুখ্য নাটকে বিশেষ ভাব-রস সঞ্চারের প্রয়োজনে, কখনও কখনও গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব পালন করেছে। সেখানে গান মুখ্য বিষয় নয়—মুখ্য তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, মারী, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এ নাটকের প্রেরণা, সেখানে মনোরঞ্জক গান প্রধান বিষয় হতে পারেনা। তাই পনের দৃশ্যের নাটকের প্রথম বারোটি দৃশ্যে গানের ব্যবহার নেই। এ নাটকে যে তিনটি গান রয়েছে—তাও নাটকের শেষে চতুর্থ অঙ্কের সমস্যাজর্জরিত মানুষ নতুন ফসল চোখের সামনে দেখে স্বস্তি ও আনন্দের আশ্বাস নিয়ে যখন শহর থেকে একে একে ঘরে ফিরছে, তখন তাদের কণ্ঠে গান উঠে এসেছে। প্রথম দৃশ্যেই ঘরে ফিরে নিরঞ্জন 'ঘরখানা জুড়েতেড়ে' নিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে আলাপচারিতার পর দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গান ধরেছে—'বড়ো জ্বালা বিষম জ্বালায় পুড়ে হব সোনা'। (৪/১) দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক পথিকের গান—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান/হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।' ধর্ম ও সম্প্রীতির গান গণনাট্যের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছে। তৃতীয় দৃশ্যে 'নবান্ন' উৎসবের মাতোয়ারা কৃষক রমণীর গান—'নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি।' প্রভৃতি বিষয়ানুগ ও সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

৪৮.১৪ অনুশীলনী ৩

১। **সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিন :**
(ক) 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা — ১০/১৮/২৪/৪৫
(খ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্র — কুঞ্জ/প্রধান/নিরঞ্জন।
(গ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র — পঞ্চাননী/বিনোদনী/রাধিকা।

২। **নিচে উল্লিখিত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন :**
রাজীব, দয়াল, মণ্ডল, নির্মলবাবু, বরকত, যুধিষ্ঠির।

৩। "তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে।" —বক্তা কে? ব্ল্যাক মার্কেট কী? 'মজুতদার' শব্দটির উৎস কী? কোনো প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন? বক্তার সম্পর্কে আপনার অনুভব সংক্ষেপে লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের নায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৫। "চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।" —বক্তা কে? কী 'চলে এয়েছে'? বক্তার মনোভাবটি বুঝিয়ে দিন।

৬। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দার / হারু দত্তের নাট্যভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অনেকটাই সার্থক। 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে মন্তব্য বিচার করুন।

৮। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপের বিশিষ্টতা ও স্বাভাবিকতা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৯। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ 'অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক'—এ মন্তব্যের যাথার্থ বিচার করুন।

১০। 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গীতসমূহের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। "এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।"—বক্তা কে? কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে? 'পোড়া মাটির দেশ' বলতে কি বুঝিয়েছেন? এ কথা বলায় বক্তার কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

১২। "তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।" —এই সংলাপ কার? নাটকীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

১৩। "ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মতো এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল!" —কার লেখা, কোন নাটকে, কার উক্তি? প্রসঙ্গটি উল্লেখ করুন। উক্তিটির মধ্যে বক্তার কি চরিত্র-পরিচয় মেলে বুঝিয়ে দিন।

৪৮.১৫ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান

মঞ্চ :

এদেশে আধুনিক মঞ্চ বলতে যেটি বোঝায় তা প্রসেনিয়াম মঞ্চ। তার নির্মাণকর্তা লেবেডফ। সেখানে তিনি যে বাংলা নাটকটির অভিনয় করান তার নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি এম. জড্রেল-এর লঘু নাটক 'দি ডিগসাইস্'-এর বঙ্গানুবাদ। তার মঞ্চগঠন পদ্ধতি দেখে আমরা মঞ্চের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। তা হল—তিনদিক ঢাকা সম্মুখ ভাগ খোলা একটি আয়তাকার ক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান যার ওপরটাও ঢাকা এবং মাঝখানটি উঁচু বেদির মতো—তাকে মঞ্চ বলা হয়। এই উঁচু মঞ্চটিকে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাজান হয়। লেবেডফ অভিনয়ে চারুত্ব সম্পাদনের জন্য মঞ্চকলার অভিনবত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। একাজে তিনি ছিলেন একাধারে স্থপতি, কারুশিল্পী, দৃশপট শিল্পী, সঙ্গীত ও অভিনয় পরিচালক। এক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশের মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চশিল্পী ফিয়োডার ভলকভের সম্ভাব্য অনুসরণ ছিল মনে হয়। তথাপি তাঁর দৃশ্যাঙ্কনে বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতিকৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পর বাংলা নাট্যমঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় পরিবর্তন আনেন ধর্মদাস সুর। ধর্মদাস ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বরে অভিনীত 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চসজ্জার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন. এই মঞ্চের পিছনে ছিল কাপড়ের ওপর হাতে আঁকা দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট বা সীনগুলো ওপর থেকে পর পর ঝোলান থাকত। দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তোলা নামানো হত সেগুলো। তারপর এই আঁকা সীনগুলির সঙ্গে দুপাশে টরমেন্টার এঁকে তার মধ্যে একটু ডাইমেনসন আনার চেষ্টা হয়েছিল। ক্রমে ওই সব কাপড়ে আঁকা স্থিরচিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু কিছু আসবাব ব্যবহার করা হত। এরপর ওই স্থির দৃশ্যপটের সঙ্গে যুক্ত করা হল ফ্ল্যাট সীন। কাঠের ফ্রেমের ওপর টান করে কাপড় লাগিয়ে তার ওপর ছবি আঁকা হত। এর সঙ্গে দুটো ফ্রেম তৈরি করা হত। দুদিক থেকে ঠেলে জুড়ে দিলে একটা দৃশ্যপট হয়ে যেত। একেই বলা হত ঠেলা সীন। আবার দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে দুপাশে টেনে নিয়ে যাওয়া হত।

এই অবস্থাকে মেনে নিয়ে মঞ্চে এলো প্যানোরামা পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৯৭ সালের আগে নতুন কোনো পদ্ধতি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে দেখা গেলনা। ১৮৯৭ সালে অমর দত্ত রঙ্গমঞ্চে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'নলদময়ন্তী'। 'নলদময়ন্তী' নাটকের বিজ্ঞাপনের একটুখানি তুলে দিলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

"নলদময়ন্তী—Splendid Lotus Scene!

একটি ক্ষুদ্র পদ্মকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরীগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।"

এই ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকে দৃশ্য সজ্জায় কাট আউটের ব্যবহার। সেট সীন, নকল আসবাবপত্রের পরিবর্তে আসল বস্তু দৃশ্যসজ্জায় এসে গেল। যেমন, আসল খাট, আয়না, চেয়াল-টেবিল ইত্যাদি।

মঞ্চ এবং মঞ্চপরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেন শিশির ভাদুড়ী। তিনি নাট্যমঞ্চে দুটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালেন। (১) পাদপ্রদীপ বা ফুটলাইট তুলে দিলেন। (২) উইংস বা পার্শ্বপট নামক কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথকে রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা নেপথ্যবিধানের অন্যতম অঙ্গ, আলোকসম্পাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন উইংস বা পার্শ্বপট প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত মঞ্চের অনুসরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট হিসেবে অঙ্কিত পশ্চাৎপট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে তখন থেকেই উইংসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উইংস মঞ্চের দুপাশে থাকত। দুটি উইংস বা পার্শ্বপটের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে আসত এবং প্রস্থান করত। এই ব্যবস্থা যখন দৃশ্য সংস্থাপনায় কাট-আউট দৃশ্য সংবলিত সেট সীনের ব্যবহার চালু হল তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ী দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট ডাইমেনসনাল বা মাত্রাবিশিষ্ট মঞ্চের প্রবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বপটের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন। তার ফল মঞ্চে শিল্পী পেলেন প্রবেশ প্রস্থানের স্বাভাবিক পথ। মঞ্চ হয়ে উঠল আরো বাস্তব এবং জীবন্ত। বাস্তব এবং জীবন্ত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, একটি ঘর দেখান হচ্ছে মঞ্চে নিশ্চয় তার দরজা থাকবে। একটা বাইরের, আর একটা ভেতরে যাওয়ার। শিল্পীরা ডাইমেনশনাল মঞ্চ পেয়ে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমনের স্বাভাবিক পথ ব্যবহার করার ফলে মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা হয়ে উঠল। এছাড়া শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে খোলা আকাশ দেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন, তবে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ডাইমেনশনাল মঞ্চ তৈরি করে মঞ্চ স্থাপত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তার পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চকে সাধারণত ফ্লাট মঞ্চ বা সমতল মঞ্চ বলা হয়ে থাকে। এই সমতল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মঞ্চকে একমাত্রিক মঞ্চও বলে যেতে পারে। এই একমাত্রিক বা One dimensional মঞ্চকে দ্বি-মাত্রিক (two dimensional) বা ত্রি-মাত্রিক (three dimensional) মঞ্চ করা যায়। একসঙ্গে যেখানে দুধরনের বা তিন ধরনের অভিনয় দেখাবার প্রয়োজন সেখানে এইরকম মঞ্চ একান্ত অপরিহার্য। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের যে মঞ্চ পরিকল্পনার নির্দেশ নাট্যকার দিয়েছেন তা দ্বিমাত্রিক মঞ্চ বা two dimensional মঞ্চ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়—

> শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বিজলি বাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই-এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে—আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাঁড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক

> কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এই নির্দেশ থেকে two dimensional মঞ্চ স্থাপত্যের ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটকে প্রথম মঞ্চ স্থাপত্যে এই ধরনের নতুনত্ব সৃজন করেছিলেন। 'সীতা' নাটকের একটি দৃশ্যে দেখাতেন, প্রাসাদ অঙ্গানে উঁচু স্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের ওপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা, কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই অভিনয়ে রত। কেউ হাবেভাবে, কেউ ভাষায়। স্পষ্টত, ত্রিমাত্রিক মঞ্চ ব্যবস্থার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের একটি মঞ্চ পরিকল্পনা এখানে তুলে দেওয়া হল। এই নাটকটি সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতায় বঙ্গারঙ্গামঞ্চে অতুলন। প্রথমে যে তাঁবুর দৃশ্য দেখান হয়েছে তা প্রেক্ষাগৃহকে সচকিত করে তোলে। পুরো মঞ্চ পীঠের আয়তন জোড়া একটি কাঠের ফ্রেমে দরবার, তাঁবুর অনুকরণে ছাপানো কাপড় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে অভ্যন্তরভাগ তৈরি করা হয়েছিল। পেছনে প্রবেশপথ এবং তার দুধারে (দর্শনানুপাত) অনুযায়ী অন্যান্য তাঁবুর অংশ তৈরি করা হয়েছিল। তাঁবুর পিছনে মোতায়েন রক্ষীবাহিনী টহল দিচ্ছে। কিংবা, দিল্লীর রাজপথ পিছনে রেখে জুম্মা মসজিদের চত্বরের দৃশ্য—যেখানে সামনে পিছনে অস্থির পদচারণা করতে করতে নাদির শাহ দিল্লী ধ্বংস করেছিলেন। 'কোতল' 'কোতল' বজ্রনিনাদ আর জনতার আর্তকোলাহলের সঙ্গে দিল্লীর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবিস্মরণীয়। শ্রীশম্ভু মিত্র বলেছেন, 'দিগ্বিজয়ী' না দেখলে, তিনি 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চ ব্যবস্থায় নাট্যকারের নির্দেশটুকু তুলে দেওয়া হল—

> দিনাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটা মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামুর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে : আর একজনের বয়স কম—গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীশম্ভু মিত্র যথার্থ কথা বলেছেন :

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' এবং 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে মঞ্চের ওপর যে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা আরো বাস্তব আরো সহজ হয়ে এলো ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালে রঙ্গমহলে 'মহানিশা' নাটকে সতু সেন প্রথম রিভলভিং বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি করে বক্স-সেটের ব্যবহার করলেন।

এরপর মঞ্চ ব্যবস্থার রীতি আরো সহজ ও সরল হয়ে এলো ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক প্রয়োজনায়। মঞ্চের ওপর কেবল মাত্র গোটাচারেক চট ঝুলিয়ে দিয়ে তাকেই দৃশ্যানুযায়ী একটু আধটু পরিবর্তন করে ঘর বার দুই দেখান হয়েছিল।

প্রসেনিয়াম দর্শক ও নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে অভিনয়কারী কুশীলবের মধ্যেকার একটা অস্বাভাবিক অবরোধ। সুতরাং এই অবরোধ উঠে গেলে নাটক ও দর্শক এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্তরে এসে পৌঁছতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তবে এই কাজে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা।

গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অত্যাচার নিপীড়ন বঞ্চনার কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং যারা তাদের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনার কারণ তাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান অর্থাৎ প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest গড়ে তোলবার ইচ্ছা। শহরাঞ্চলের স্থবির মঞ্চের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে, মুক্তাঙ্গনে নাটককে নিয়ে যেতে হবে। তা করতে গেলে আয়েজানবহুল মঞ্চকে হালকা করে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত কিছুকেই সহজ সরলীকরণ করে নিতে হবে। সহজ ও সরলীকৃত হওয়ার প্রবণতা যে রঙ্গামঞ্চের মধ্যে নিহিত আছে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি নাট্যমঞ্চ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। শিশির ভাদুড়ী যে দৃষ্টিভঙ্গিটির আভাস রেখে গিয়েছিলেন, গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সেই ইঙ্গিতটুকু অবলম্বন করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হলেন। গণনাট্যের নাট্যকর্মীরা চল্লিশের দশকে পেশাদারী নাট্যমঞ্চের বাইরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। তার জন্য রঙ্গামঞ্চের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে সহজ সরল করে নেওয়ার জন্য ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা সুরু করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার রীতিতেই পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গামঞ্চে এসেছে 'সাজেসটিভ' মঞ্চ। 'নবান্ন'র হাত ধরে সাজেসটিভ রিয়ালিজমের হাওয়া বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এসে বাঙলার পেশাদার রঙ্গামঞ্চগুলিকে নাজেহাল করে তোলবার চেষ্টা চালিয়েছে। আর তার জন্যই মঞ্চ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে শহরে, গ্রামে যত্রতত্র। এই রীতিতে শুধুমাত্র একটা কালো পর্দার সামনে গুটিকয়েক আসবাব দিয়ে কিংবা তার বদলে কাঠের বাক্স সাজিয়ে সাজেসটিভ সেটে নানা পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। তার ফলে নাটকের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, নাটক হয়ে উঠছে মানুষের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। একাজে অবশ্য আর একটা নেপথ্য বিধান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার নাম আলোকপাত। পরে সেই আলোকসম্পাতের বিবর্তনের চেহারাটা সুস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঞ্চ-আলোকসম্পাত—আবহসংগীত :

এখন মঞ্চে আলোকসম্পাত ধ্বনি এবং আবহসংগীত প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের বিশিষ্ট অঙ্গাগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'নবান্ন' নাটকের ক্ষেত্রেও এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিচারে এগুলিও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গো গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাটককে মনোজ্ঞ করে তুলতে, নাটককে রসগ্রাহী করে তুলতে গেলে এদের ভূমিকা অপরিসীম। রঙ্গামঞ্চের নেপথ্যে পশ্চাৎপটে যে আর এক ধরনের অভিনয়, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গো সমান্তরালভাবে চললে নাট্যাভিনয় একটি নিটোল রসরূপ পায়, তার একান্ত ঘনিষ্ট অঙ্গা হল ঐগুলি। 'নবান্ন' নাটককে নিটোলত্ব দান করেছে মঞ্চব্যবস্থা, আলোকসম্পাতের নতুনত্ব এবং আবহসংহীতের অভিনব আয়োজন। অতএব এ সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে।

নেপথ্যবিধান ও 'নবান্ন' নাটক :

নাট্যাভিনয় বা থিয়েটারের দুটি অংশ : (১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। নট-নটী অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ ও অঙ্গাভঙ্গি সহযোগে অভিনয় মঞ্চে ঘটতে থাকে। আর এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাঙ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলবার জন্য নেপথ্য অভিনয়ের অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এই দ্বিতীয় অভিনয় বা নেপথ্য অভিনয়কে নেপথ্যবিধান বলে। নেপথ্যবিধান অভিনয়ের সঙ্গো একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গাতিসম্পন্ন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। উভয়ে সুসঙ্গাত সহযোগিতায় নাটকে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি হয়। 'নবান্ন' নাটক শুধু কাহিনীগত গতানুগতিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়নি, মঞ্চ সজ্জায়, আবহসংহীতে এবং আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, যা গণনাট্য সংঘের এক লক্ষণীয় প্রচেষ্টা। পেশাদার মঞ্চ পরিকল্পনার বাইরে নাটককে গণনাট্যকে রূপান্তরিত করে যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, আজও সেই প্রবাহে পরবর্তী নাট্য আন্দোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আলোকসম্পাত ও 'নবান্ন' :

ভারতবর্ষ, কি ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত নাট্যাভিনয় প্রাচীনকালে করা হত তা বস্তুত হত দিনমানে। তখন মঞ্চে আলোকের উৎস ছিল সূর্য। উন্মুক্ত আকাশের তলে তখন অভিনয়পর্ব চলত, সূর্য নামক একটি আলোক উৎসের অজস্র রশ্মিপুঞ্জ রঙ্গামঞ্চে অপর্যাপ্ত আলো সরবরাহ করত। কিন্তু নাট্যাভিনয় যে দিন থেকে উন্মুক্ত আকাশ পরিত্যাগ করে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এসে পড়ল, সেদিন থেকে স্বাভাবিক আলোক উৎস থেকে রশ্মি সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা পড়ল। তখন থেকেই আলোর অস্বাভাবিক প্রয়োগকৌশলে নাট্যমঞ্চ যেন কথা বলে উঠল, এক নতুনতর প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিতে চনমন করে উঠল।

প্রথমে প্রেক্ষাগৃহ বিশিষ্ট রঙ্গামঞ্চে আলো সরবরাহ করত মোমবাতি কিংবা তেলের বাতি। এই মোমবাতি

কিংবা ল্যাম্পের আলো সামনে থেকে পড়ত মঞ্চের ওপরে। তারপরে এলো গ্যাসের আলো। গ্যাসের আলোই ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের উৎস। অর্থাৎ ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ ব্যবহার রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল গ্যাসের আলো আসবার পর থেকে। তারপর শহরে বৈদ্যুতিক আলো আসবার সঙ্গে সঙ্গে শহুরে সভ্যতায় ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সেইরকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চেও। এই আলো সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকের সামনে তুলে ধরল।

বাংলা রঙ্গমঞ্চেও এবম্বিধ পরিবর্তন এলো। গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটকে আলোকসম্পাতের একটা দারুণ শিল্পসম্মত সুযোগ আছে। আলোর এই শিল্পসম্মত প্রয়োগ না হলে 'নবান্ন' নাটক অত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে মঞ্চসজ্জা চলে, কিন্তু আলোর প্রয়োগকৌশল আরোপিত না হলে ছেঁড়া চট চটই থেকে যায়। মঞ্চমায়া সৃষ্টি হয়না। এই নাটকের কোনো কোনো স্থানে প্রতীকধর্মী পরিবেশ সৃজনে আলো অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার ফলে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছে বাস্তবের জীবন্ত নাট্যরূপ।

আলো কেমনভাবে নাটকে এত জীবন্ত বাস্তবের প্রতিরূপ গড়ে তোলে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সময় থেকে বাংলা নাটকের প্রয়োগরীতিতে সংযোজিত হয়েছে অভিনব এক অধ্যায়। আদিতে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের ব্যবহার হত। রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে প্রান্তিক অঞ্চলে একফুট উঁচু করে ফুটলাইট বসানো হত। এর ফলে তার থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিপুঞ্জ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওপর পড়ে সৃষ্টি করত একটা প্রস্থায়া। সেই ছায়া পশচাঋপটের ওপর পড়ে একটা কিম্ভুতকিমাত্রার পরিবেশ তৈরি করত। ফলত দর্শক মনে সামগ্রিক ইম্পেশন সৃষ্টিতে বাধা হত। তাই প্রথমে প্রয়োজন হল পশচাৎপটের এই ছায়া দূর করবার। তাই প্রসেনিয়ামের পিছনে টাঙনো দু'ফুট চওড়া ঝালর (যেটি রঙ্গপীঠের ওপর থাকত)-এর অন্তরালে জ্বালান হত বালবের ছড়ি। এইভাবে চতুর্দিক আলোয় ঝলমল করে ওঠবার ফলে ছায়া স্পষ্ট হয়ে পশচাৎপটে পড়তে পারলনা। প্রচ্ছায়া ভুতটা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটক প্রযোজনা কালে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ তুলে দিলেন। পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো এইরকম—দিবাভাগে সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে। সারাদিন ভূপ্রদক্ষিণ করে অপরাহ্নবেলায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। রাত্রে চাঁদ থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের আলো, গ্যাসের আলো প্রভৃতি সবই ওপর থেকে পড়ে, নয়তো আসপাশ থেকে পড়ে। আলোকরশ্মি প্রক্ষেপণের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মে শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে আলোক ক্ষেপনের ব্যবস্থা করলেন, তাই তিনি তুলে দিলেন ফুটলাইট, আমদানী করলেন ফ্লাডলাইট, স্পটলাইট। সাধারণভাবে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত করবার জন্য ফ্লাডলাইট। পার্শ্বলাইট থেকেও আলো সরবরাহ করা যেতে পারে। আর কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ

মুখ বা অবয়ব বা অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য তিনি ব্যবহার করলেন স্পটলাইট। স্পটলাইট হল তাই—যা নির্দিষ্ট কোনো অংশ বা স্থানকে আলোকিত করতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিক্ষেপণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল ডিমার বা ধীরে ধীরে আলো বাড়াবার কমাবার যন্ত্র।

এই ব্যবস্থার গুরুত্ব এই যে হঠাৎ আলো জ্বলল এবং তীব্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হল বা হঠাৎ আলো নিভে গেল, এতে মঞ্চের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় এবং অভিনেতার অভিব্যক্তির ক্রমবিলীয়নাম রূপটা ঠিকভাবে ফু উঠে অভিনয়কে ব্যঞ্জনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করে। ধরা যাক 'নবান্ন' নাটকের একটি দৃশ্য, যেখানে কুঞ্জর হাতে কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে। সেই রক্তাক্ত কম্পিত হাতটা নিয়ে যে যন্ত্রণাকাতর মুখে রাধিকার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর রাধিকা নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিচ্ছে এবং একসময় দুজনে দুজনার মুখের দিকে গভীর প্রেম ও মমতাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আর আলোটা একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অংশে পাত্রপাত্রীর মুখে কথা নেই, কিন্তু আলো এই অংশে কথা বলছে। বেদনাঘন মুহূর্তটা দর্শক মনের পরতে পরতে গেঁথে দিয়েছে। এখানে স্পটের সঙ্গে ডিমার যদি না থাকত, তাহলে আলোটা দপ করে নিভে যেত। শেষ, মুহূর্ত পর্যন্ত কুঞ্জ রাধিকার উদ্বেল হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখান সম্ভব হত না, যা তাদের নীরব দৃষ্টির অশ্রুক্ষরণের মধ্যে দিয়ে দর্শক মনের প্রত্যন্ত প্রদেশের নিস্তরঙ্গতায় বেদনার তরঙ্গকে উদ্বেল করে তুলছে। একাজ করেছে ডিমার যুক্ত স্পটলাইট। এতএব স্পটলাইট আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র।

এরপর আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আরো বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সতু সেন। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সতু সেন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন, নাট্যনিকেতন মঞ্চে 'ঝড়ের রাতে' নাটকে। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সাহায্যে রঙ্গামঞ্চে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খুব বাস্তব রূপে তিনি ফুটিয়ে তোলেন। রঙমহলে 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে কয়লার খনির যে দৃশ্য দেখান হয়েছিল তা দর্শকদের বিশেষ ভাবে চমৎকৃত করে। পরবর্তীকালে তাপস সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

আলোর এই বিস্ময়কর চাতুর্য অবশ্য ঘটেছিল বাঁধা মঞ্চগুলিতে, যা পেশাদার মঞ্চ বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার মঞ্চের বাইরে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে আলোর খেলা দেখাবার কৃতিত্ব বোধহয় গণনাট্য সংঘের। এখানে 'নবান্ন' নাটকে আলো কি রকম প্রতীকধর্মী অভিনয় করেছে তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। দ্বিমাত্রিক মঞ্চে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। বিয়ে বাড়ি, ফটকের ভেতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার রাস্তা। দু'পাশে চেয়ার পাতা, সেখান দিয়ে লোকজন ভেতরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে আসছে, একপাশে বাড়ির কর্তা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথাবার্তা চলছে। এখানে আলো খুব উজ্জ্বল। অর্থ, বৈভব, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর উৎসবের উদ্দাম আনন্দের সঙ্গে আলো এখানে যথেষ্ট সঙ্গাতিসম্পন্ন। ঠিক এরই একপাশে

রাস্তা, একটা ডাস্টবিন, সেখানে কুকুর আর মানুষের সহাবস্থান। উভয়ে ডাস্টবিন ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এখানে আলো অল্প। নাট্যকার তারই নির্দেশ রেখেছেন। নাট্যকারের নির্দেশ থেকে একটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, এই সব গরীব ভিখিরি মানুষগুলোর জীবনে সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তাই আলোও নেই। নৈরাশ্য আর অসহায়তার তমিস্রায় তাদের জীবন আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানে উজ্জ্বল আলো একান্ত অপ্রয়োজন। স্পটলাইটের স্বল্পালোকে তাদের সামাজিক অবস্থানের প্রতীকধর্মী মঞ্চরূপ গড়ে উঠেছে। এই দৃশ্যে দুই স্তরের মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্দেশে আলো এখানে প্রতীকধর্মী ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য আলো ছাড়া আরো একটি বস্তু নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আবহসংগীত। যেটি নেপথ্য বিধানের তৃতীয় বস্তু। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে, নাটকের পরিভাষায় আবহসংগীতের অর্থ এইভাবে করা যায় যে, নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনয়ের ঘটনার অনুসঙ্গী সংগীত, ইংরাজীতে যাকে background music বলে। আবহসংগীতের আভিধানিক অর্থও তাই। সংগীত নাটকের পাত্রপাত্রীর অভিনয় দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত, মর্মস্পর্শী করে তোলে, বা অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যে সংগীত তাকে আবহসংগীত বলা হয়। 'নবান্ন' নাটক থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। বিবাহ বাড়ি, মঞ্চসজ্জা, পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা এবং তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝবার পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই যে দৃশ্যটা বিবাহের। তাহলেও নাট্যকার নির্দেশ দিলেন যে, এখানে সানাই-এ 'আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে'। এর কারণ এটাই বিবাহের অনুষ্ঠানে সানাই-এর একান্ত অপরিহার্য 'রাগ'। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াল যে পরিবেশ সৃষ্টি। উক্ত দৃশ্যকে বাস্তবধর্মী করে তোলবার জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়াস।

কিন্তু প্রশ্ন, যে দৃশ্যে নাট্যকারের নির্দেশ নেই, সেখানে কি তাহলে আবহসংগীত হবে না? যেমন ধরা যাক, কুঞ্জর রক্তাক্ত হাত দেখে রাধিকা চমকে 'ওমা একেবারে কামড়ে খেলে গো' বলে সে সংলাপটা উচ্চারণ করল, এখানে ওই চরিত্রের আতঙ্কিত হওয়া, পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, অনুরাগ রঞ্জিত হৃদয়ে 'ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা।'—সংলাপ-অনুভূতি স্তরগুলিকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের কি দরকার নেই? প্রথমে 'ওয়াইলড্‌লি' চিৎকার, তারপর রাধিকা যখন দেখে কুকুর অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে তখন ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে নিয়ে বেঁধে দিতে দিতে অসহায় বোধ নিয়ে বলে, 'ওমা আমার কি হবে গো' বা গভীর মমতায় 'খুব যন্তন্না হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?' প্রভৃতি উচ্চারণ সংবেদনশীল হৃদয়ের অনুভূতিকে গভীরতম তলে পৌঁছে দেয়। এটিকে প্রকাশ করতে নিঃসন্দেহে অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার দরকার, এর জন্য প্রয়োজন স্বরগ্রামে—এই খেলা অতিসাধারণ অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা যেমন অভিনেত্রীর ক্ষমতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, ঠিক তেমনই আবহসংগীত অভিনেত্রীকে অনেক বেশি সাহায্য করে দর্শক হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার জন্য। আর একটি জায়গা, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য, প্রতিবেশী দয়াল প্রধানের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে নিয়ে

গেছে অভুক্ত স্ত্রী রাঙার মাকে খাওয়াবার জন্য। কিন্তু গিয়ে পৌঁছানর পূর্বেই বন্যা অতর্কিতে আক্রমণ করে নিয়ে গেছে সকলকে ভাসিয়ে, বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত সর্বহারা দয়াল এর পর উন্মাদের মতো ছুটে আসছে কুঞ্জর কাছে বাইরে থেকে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দিতে দিতে।

(নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ... কুঞ্জ! ... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ।

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল...সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

ঝড়ের শব্দ—সাঁই সং.

দৃশ্যাংশটুকুর অভিনয় পুরোটাই আবহসংগীত নির্ভর। নাট্যকারের নির্দেশ থাক বা না থাক, অভিনেতা যতই ক্ষমতাসম্পন্ন হোন, দর্শক মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলবার জন্য এখানে আবহসংগীতের একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগিতার খুব দরকার। কিংবা দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে রাধিকা কুঞ্জর হাত বেঁধে দিচ্ছে আর কাঁদছে—তারপর উভয়ে উভয়ে মুখেণ্ণ দিকে তাকিয়ে—এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আবহসংগীত তো এদের অব্যক্ত বক্তব্যকে, নিবিড় প্রেমের নিদারুণ বেদনাকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দেবে।

আবহসংগীত বলতে আমরা বুঝি এ্যাফেক্ট মিউজিক অর্থাৎ প্রভাব বিস্তারকারী সুরলহরীকে আর শব্দ সংযোজনাকেও এই অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 'নীলদর্পণে'র কথা ধরা যাক, যেখানে চারজন রাইয়ত হঠাৎ অফ ভয়েসে মজুমদারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সেই মুহূর্তে মনে আতঙ্ক জেগে উঠল। আবহসংগীতের প্রভাব এখানে অনস্বীকার্য। অথবা, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার দৃশ্যে—আবহসংগীত ছাড়া

এ দৃশ্যের অভিনয় চিন্তা করা যায়না। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের শেষাংশে—

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কারসঙ্গে কী কথা বলিস ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধিকা। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

(আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুই শব্দ করতে থাকে)

প্রধান। মাখন, মাখন রে ে-ে-ঃ, —কুঞ্জ, দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ্।

(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

এই অংশে যেখানে সংলাপ আছে সেখানে তো বটেই, যেখানে সংলাপ নেই সেখানেও আবহসংগীত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলে পুরো ব্যাপারটা মর্মগ্রাহী হয়ে উঠতেই পারবে না।

অতএব নাটকে আবহসংগীত একান্ত অপরিহার্য একটি নেপথ্য বিধান। এই বিশেষ নেপথ্য বিধানটি নাট্যাভিনয়ের প্রথম দিকে বিশেষভাবে অবহেলিত ছিল। এটা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়নি। তাই যত্রযত্র যেরকম সেরকম musical instrument ব্যবহার করা হত। তার যুক্তিসংগত কারণও ছিল। তখন পরিচালকরা অভিনয়ের ওপর জোর দিতেন, আর দর্শকরা অভিনয়টাই দেখতে যেতেন। তাই চরিত্রের মুখে নাট্যকাররা জুগিয়ে দিকেন অজস্র কথার বুনানী অর্থাৎ সংলাপ। অভিনেতৃবর্গ কণ্ঠস্বরের উৎক্ষেপণ—কম্পনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন স্বরগ্রামে নিয়ে গিয়ে দর্শক মনে দাগ টানবার ব্যবস্থা করতেন। তাই আবহসংগীত ব্যাপারটা তখন নেহাতই গৌণ ছিল। সম্ভবত, সেই কারণে 'নীলদর্পণে'র মত নাটকের প্রথম অভিনয়ে

চুনাগলির ফিরিঙ্গি কনসার্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। তার জন্য সমকালীন সংবাদপত্রে এই বিসদৃশ সংগীত সংযোজনার যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকে থিয়েটারে ফিরিঙ্গি কনসার্টই ব্যবহার করা হত। লেবেডফ তার নাটকে বিলিতি বাজনদারদের এনেছিলেন। কিন্তু মোট কথা, তখনকার দিনে নাট্যাভিনয়ে ফিরিঙ্গি কনসার্টের নিঃসপত্ন আধিপত্যকে অস্বীকার করা যাবেনা। পরবর্তীকালে নাট্যাভিনয়ে বীর, করুণ ইত্যাদি রস বোঝানোর জন্য, ক্লাইম্যাক্স বোঝানোর জন্য ঝাঝ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন বেহালা, ক্লারিওনেট, বিভিন্ন পর্দার আড়বাঁশী, ছোট বড় নানারকমের ঝাঝই ছিল আবহসংগীতের উপকরণ।

নাট্যাভিনয়ে সুসংহত, সুপ্রযোজিত আবহসংগীতের প্রয়োগ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তার 'সীতা' নাট্যাভিনয় থেকেই প্রথম আরম্ভ হয় নাট্যক্রিয়াকে তীব্রতর এবং অভিনয়ের রস ঘনীভূত করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের সুসংহত ব্যবহার। এই কাজ করবার জন্য তিনি তখনকার ব্রডকাস্টিং কপপোরেশনের বাংলা কর্মসূচীর অধ্যক্ষ অদ্বিতীয় ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন মজুমদারকে ডেকে আনেন। 'স্বর্ণসীতা গড়বার প্রয়োজনে যখন ভারবাহীরা সোনার তাল বহন করছে নীরবে, তখনকার তীব্র বিরহ বেদনাসূচক আবহসংগীত আজও আমার কানে বাজছে'—একথা বলেছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবহসংগীত একটা আলাদা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ে নেপথ্য বিধানের এই অঙ্গটির অনুপস্থিতি আজ আর কল্পনা করা যায় না। বাচিক অভিনয় হোক, মুকাভিনয় হোক কিংবা অঙ্গাভিনয় হোক, আবহসংগীত সমান তালে চলতে থাকে। অভিনেতার বিভিন্ন মুডকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিভিন্ন ভাষাহীন অভিব্যক্তির ভাষা প্রদান করে আবহসংগীত নাটকের একটা সামগ্রিক রসরূপ, শিল্পরূপ গড়ে তোলে। যা উপরিস্তরে ভাসমান থাকে, তাকে গভীর থেকে গভীর স্তরে নিয়ে গিয়ে একটা দাগ কেটে দেয়। অর্থাৎ কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ আকুল করে তোলে। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আজ আবহসংগীতের নিঃসপত্ন আধিপত্য।

নাট্যসাহিত্যে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম শতকের ন্যূাধিক শেষ দু'দশক নাট্যজগতের গৌরবজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত হতে পারে ঠিক, কিন্তু নেপথ্য বিধান সম্পর্কে অর্থাৎ মঞ্চ, আলো ও আবহসংহীত সম্পর্কে পথিকৃৎ হচ্ছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত অপেশাদার গোষ্ঠী। তার মধ্যে প্রধান হল গণনাট্য সংঘ। 'নবান্ন' নাটকে 'গণনাট্য সংঘ' প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য জগতের সুসংহত মেলবন্ধন ঘটিয়ে টীমওয়ার্ক ধর্মী নাট্য পরিবেশন রীতির প্রবর্তন করে—এ সম্পর্কে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন বটে তবে কালের বিচারে তা গ্রাহ্য হবেনা। 'নবান্ন' নাটকেই প্রথম দেখা গিয়েছিল বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী অতি প্রচলিত ভাষার রথে চেপে ধ্বনি, আলোক ও মঞ্চকৌশল সমন্বিত বাস্তবানুগ পরিবেষ্টনীর মাঝে খুবই বিশ্বাসগ্রাহ্যভাবে যাত্রা শুরু করে অতি সহজেই দর্শক হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। সেদিনই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বুঝেছিল অভিনয় জগতে

একাধিপত্যের দাপট আর খাটবে না। তাকে টেক্কা দেবার মতো শিশু জন্মগ্রহণ করে গেছে। এখানেই গণনাট্য সংঘের আন্দোলন, এখানেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের বিশেষত্ব। এখানে একান্ত বাস্তবধর্মী 'নবান্ন' নাটকের নেতৃত্ব। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস 'নবান্ন' নাটকটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেখা হয় এইজন্যে যে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল নাট্য আন্দোলন। জীবন ও গভীর জীবন প্রত্যয় যার বিষয়, জীবনের বাস্তবানুগ উপস্থাপনা যার লক্ষ্য। বক্তব্য মানুষের পক্ষে—খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে—শোষণ নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে।

৪৮.১৬ 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের পর নাটকের 'যবনিকা' পাত ঘটেছে। এটিই শেষ দৃশ্য। এ দৃশ্যের পটভূমিকা 'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। পরিবেশ কলহাস্যমুখর। নবান্ন উৎসব চলছে। মোরগের লড়াই, লাঠিখেলা ও কৃষাণীদের গানে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল।' ইতোমধ্যে এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শহর থেকে ফেরা নিরঞ্জন-বিনোদিনীর নতুন করে গুছিয়ে নেয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে অকস্মাৎ 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার 'মাথা নাড়তে' প্রবেশ করে। এমনাড়তেভাবে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটনার সূচনা, পরে বিস্তার, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ, শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন এবং সেই সঙ্গে দয়ালের বক্তব্য 'মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে, তবু মরিনি...আমরা', 'এবার আর আকাল এসে আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না', 'জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ'—প্রভৃতি আপ্তবাক্য সুলভ সংলাপের অতিনাটকীয়তা ও পূর্বাপর রহিত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আতিশয্যের জন্যই, নাটকাভিনয় দেখে, সে দিন এই দৃশ্যটি সম্পর্কে কিছু প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গম মঞ্চে একাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর 'নবান্ন' নাট্যামোদী, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল সাড়া এনে দিয়েছিল। নাটক ও প্রযোজনার অন্যতর চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি এক নতুন দিগন্তের আভাস এনে দেয়। গণনাট্যের জয়যাত্রার শুরু এখান থেকে।

নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার দিক থেকে 'নবান্ন' যতটা অভিনন্দিত হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে নাটকটি ততটা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এর ঘটনা পরম্পরা একটি অখণ্ড কাহিনীর ক্রমবিকশিত রূপকে তুলে ধরার চেয়ে, নাটকীয় আবেগকে একমুখী করে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি ও আবেগ বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগী। সাধারণ কৃষক ও নিম্নবিত্ত কতকগুলি মানুষ ও তাদের সমাজজীবনের অবলম্বন হলেও তাকে নাট্যরসাশ্রিত করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে পরিচয় নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়নি। তাই নবান্নের কোনো

কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এঁদের কেউ কেউ শেষ দৃশ্যটিকে নবান্নের দুর্বলতম অংশ বলে মনে করেন। "নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ওই অংশগুলিতে ঘটনা বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড।" "এই দৃশ্যে গ্রন্থাকার যেভাবে তার উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিবিহীন।" ('নবান্ন'—হিরণকুমার সান্ন্যাল, পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১)।

সমালোচকের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, নাটকটির প্রথমাংশে গ্রাম বাঙলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও তৎসহ নাট্য কাহিনীতে একটি গতিবেগ আনবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা অনেকটা স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি—রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ঘটনার টানাপোড়েন, দুর্ভিক্ষ মহামারী—বন্যায় বিপন্ন মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনার দায় নিয়ে সেদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখার ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তে ছিল। প্রয়োজন ছিল সাধারণ মানুষকে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন এবং ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নবান্ন নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে দায় ও দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করেছে।

চার অঙ্কে বিন্যস্ত 'নবান্ন' নাটক বঙ্গদেশের অনাদৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রথম আলেখ্য। প্রথম বাংলার চাষী মজুরের 'দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সংকল্পের চমৎকার বাস্তবসম্মত চিত্র'। এর পটভূমিতে আছে তৎকালের বাংলাদেশের তিন বৎসরের ঘটনা। ১৯৪২-৪৪ সালের গ্রাম বাঙলার জনজীবনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে নাট্যকার অতি স্বচ্ছন্দভাবে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য গণজীবনের বিস্তৃত পরিসরটি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া মানুষের মাধ্যমে নতুন এক বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবন দর্শনকে প্রকাশ করা, যার প্রতিপাদ্য 'সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ' চেতনা সঞ্চার করা। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি তুলে ধরবার জন্য প্রাথমিকভাবে দুর্গত পল্লী ও পল্লীবাসীর সঙ্কটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন প্রথম অঙ্কের দৃশ্য পরম্পরায়। প্রথম দৃশ্যের পটভূমি : বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আর এখানে '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন দেশব্যাপী অগণিত মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তাক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনাকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন—"সুদূরের পটভূমি রক্তিম। ... হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর উর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি।"—এ থেকে বোঝা যায় বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমি তখন অগ্নিগর্ভ। এ হেন পরিস্থিতিতে আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার তিন গোলা ধান নষ্ট করে, নৌকা আটকে রাখে, আবার দুই ছেলেকে নিয়ে আগস্ট

আন্দোলনেও যোগ দেয়। তার স্ত্রী পঞ্চাননী পুলিশী সন্ত্রাস অত্যাচারের ভয়ে ভীত 'মেয়েমানুষের লজ্জা শরম খুইয়ে বনেজঙ্গালে গিয়ে' পহরের পর পহর বসে গ্লানির প্রতিবাদ করেও যখন কোনো সুরাহা হয় না দেখে তখন নিজেই বিদ্রোহের মশাল হাতে জনতার নেতৃত্ব দেয়, অবিচল দৃঢ়তায়; উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে। পক্ষান্তরে, কুঞ্জ মনে করে দেশের মানুষের প্রস্তুতিবিহীন সংগ্রাম আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। আর যুধিষ্ঠিরের সংলাপ নেহাৎই প্ররোচনাকারীর বক্তব্য। সব মিলিয়ে দৃশ্যটিতে বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট আন্দোলনের উত্তেজনার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙলাদেশের মানুষ সেদিন যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। এ তো নেপথ্যভূমি।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালীর বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। অভাবের তাড়নায় সমাদ্দার পরিবার বীজধানের শেষে ঘরের থালা বাসন বিক্রি করে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করছে, তৎসত্ত্বেও সহৃদয়তা হারায়নি। প্রতিবেশী দয়ালকে সংগৃহীত সামান্য খুদকুঁড়ো থেকে মুঠোকখানেক দিতে দ্বিধা করেনা। নিরঞ্জন এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুর্দৈব এতক্ষণ বোধ করি প্রতীক্ষা করছিল। আকস্মিক দমকা বাতাসকে সঙ্গো নিয়ে সাত-আট হাত উঁচু হয়ে আসা বান আর প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। প্রধানের দোচালা ভেঙে 'ঘর বার' সব একাকার হয়ে যায়। এর সঙ্গো তাল মিলিয়ে মহামড়ক উজাড় করতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এরই মধ্যে বাঁচবার সংগ্রাম চলে, সমাদ্দার পরিবারের। এ হেন বিপর্যয়ে, সঙ্কটে হায়েনারা স্থির থাকতে পারেনা। তাদের লোভী দৃষ্টি মানুষের শেষ সম্বলটুকুতেও হাত বাড়ায়। হারু দত্ত গ্রামের মহাজন, সমাদ্দারদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমি কাড়তে উদ্যত হলে, কুঞ্জ বাধা দেয়। পরিণামে হারুর লাঠিয়ালের আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়-তৃতীয় অঙ্ক সমাদ্দার পরিবারের শহরবাসের ইতিকথা। ভিন্নতর পরিবেশে অনভ্যস্ত জীবনচারণে প্রতিপদে আত্মাবমানানা সহ্য করতে না পেরে প্রধান, গ্রাম বাঙলার পিতৃপুরুষ, কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। কুঞ্জ, রাধার নগরজীবনের সীমাহীন হৃদয়হীনতায় স্বগ্রামে ফিরে যাবার সংকল্প নেয়। কালীধন সেবাশ্রমে (?) বিনোদিনীর সঙ্গো নিরঞ্জনের পুনর্মিলন ও ধাড়ার সমস্ত হীন ব্যবসার পুলিশ সংবাদ দিয়ে, সচক্র ধরিয়ে দেয় এবং পরিশেষে তারা ঘরে ফেরে।

বস্তুত প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে ৪২-৪৩ সালের আমিনপুর তথা গ্রামবাঙলার যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন ব্যাপক ও বাস্তবানুগ, তেমনি নাটকীয়। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরার তালিকাকে ক্ষুধা মারী মন্বন্তরে পীড়াগ্রস্ত আর্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস বলা যায়। কিন্তু ইতিহাস তো কোথাও থেমে থাকে না। আর তাই শুধু ধ্বংসের বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংস যতই বড় হোক, প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সেখানেই শুরু। শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের বাঁচবার

আশা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সে তো চিরন্তন! মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিঃশেষে মরে না, 'নবান্ন' সেই বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে। দয়াল বলেছে—"মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, ... আমরা তো বেঁচেই আছি। কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।" কিন্তু কি সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র যা মানুষের বুকে বল, মনে শক্তি জোগায়—ভয় থেকে অভয়ে পৌঁছে দেয়? 'নবান্ন' সেই সংবাদ বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে—"জোর জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!" এভাবেই তো মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করে। এখানেই বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনচেতনার পরিচয়। 'নবান্ন' নাটকের এই উপসংহারে পৌঁছুবার জন্য মানস প্রস্তুতি ঘটেছে চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, গাতায় খাটার প্রতিশ্রুতিতে। সংঘশক্তির এখানেই প্রতিষ্ঠা। তারপর "জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্য দিয়ে" 'ধর্মগোলা' স্থাপনের সঙ্কল্পে তার প্রাণসঞ্চার। তৃতীয় দৃশ্যের প্রতিরোধ তো তারই পরিণত রূপ। দয়াল আমিনপুরে নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে যে পাথেয় সংগ্রহ করেছে, সেখানে থেকে গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যটা তাই নাটকের প্রথমাংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি পণ্ড হয়েছে, তা বলা যায়না। নিরঞ্জন বিনোদিনী, কুঞ্জ রাধা এবং প্রধানের শেষ অঙ্কে পর্যায়ক্রমে ঘরে ফেলা একাট উপলক্ষ্য মাত্র।

পরিশেষে আর একটি কথা। নাটকের শেষ দৃশ্যটি নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও কোনো কোনো সমালোচকের মতে এ দৃশ্যটিই সব চাইতে ভালো। কেন না এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। তৎসত্বেও দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। গণনাট্য সংঘ, তার অনন্য সংঘশক্তি ও অভিনয় নৈপুণ্যে এই দৃশ্যটি সম্পর্কে জনমানসে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিচারে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, নবান্নে আপাতঃ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও, একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

৪৮.১৭ সারাংশ

আধুনিক নাট্যাভিনয়ে আলো, ধ্বনি, আবহসংগীত প্রভৃতি গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলিকে নাট্যাভিনয়ে বা থিয়েটারের পরিভাষায় বলে নেপথ্য বিধান। থিয়েটারের দুটি অংশ—(১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ বা বাচিক ও অঙ্গাভঙ্গি সহযোগে মঞ্চে প্রত্যক্ষ অভিনয়ে। এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাগ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য নেপত্য বিধানের অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এতদুভয়ের সুসঙ্গত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটক বাঞ্ছিত রস জারণ করতে পারে। নবানের কাহিনী শুধু গতানুগতিকতা বর্জিত হয়, এর